প্রচ্ছদ : অমলেন্দু ঘোষ

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৬০

পুস্তক বিপণি-র পক্ষে অনুপকুমার মাহিন্দার কর্তৃক ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

নিবেদন

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্ন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি বাস্তব ও জীবনধর্মী নাটক রচনার পথিকৃৎ। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে "কুলীনকুল সর্বস্ব" নাটক রচনার মাধ্যমে তিনি বাঙালীর নাট্যসাধনার মানস-মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। এটি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক—সমাজ-সমস্যা অবলম্বনে রচিত এটিই প্রথম বাংলা নাটক। এ নাটক রচনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে সেদিন বাংলা নাট্যান্দোলনের স্বর্ণদ্বারও উন্মোচিত হয়েছিল। বিষয়বস্তু ও শিল্পমূল্যের বিচারে 'নাটুকে' রামনারায়ণের এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে এ নাটকের নতুন সংস্করণের প্রকাশ।

"কুলীনকুল সর্বস্ব" সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রামনারায়ণের জীবিত থাকাকালেই এ নাটকের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আমরা এক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করেছি। উদ্দেশ্য—সমাজসচেতন প্রথম মৌলিক বাংলা নাটকের অবিকল রূপটিকে তুলে ধরা। কারণ পরবর্তীকালে রামনারায়ণ এ নাটকের অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন।

এ গ্রন্থ প্রকাশে 'পুস্তক বিপণি'-র শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

সত্যব্রত দে

সনাতন গোস্বামী

সূচিপত্র

ভূমিকা

পথিকৃৎ রামনারায়ণ

বাংলার প্রথম মৌলিক সামাজিক নাট্যকার নাটুকে রামনারায়ণ অর্থাৎ রামনারায়ণ তর্করত্নের জীবনের যেটুকু তথ্য অবগত হওয়া যায় তার মূল উৎস মুখ্যত তাঁর আত্মজীবনীর খসড়া। তর্করত্নের হরিণাভির বাড়ীতে অনুসন্ধান করে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ. কতকগুলি কাগজপত্র পান। তার একখানিতে রামনারায়ণের নিজের সম্বন্ধে কিছু স্বহস্তলিখিত notes ছিল। ভারতবর্ষ ১৩২৩ কার্তিক সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাহিত্য সাধক চরিতমালায় (৫ম সংখ্যা) রামনারায়ণের জীবনী ও রচনাবলীর তালিকা সংকলিত করেছেন। প্রথমে নাট্যকারের নিজের জবানীতেই তাঁর জীবনকথার প্রাসঙ্গিক অংশ শোনা যাক।

'সন ১২২৯ সালে আমার জন্ম। আমার পিতৃঠাকুরের নাম ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিণাভি গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থ প্রবিষ্ট হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্যপদে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে (বাঙ্গলা ১২৬২ সালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।

'১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তুত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দেন।

'কুলীন কুলসর্বস্ব ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু ৫০ টাকা পারিতোষিক দেন এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০ টাকা দান করেন।

'বেণীসংহার নাটক ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়। ঐ নাটক কলিকাতা জোড়াশাঁকোস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতন বাজারে বাবু জয়রাম বসাকের বাটীতে অভিনীত হয়।

'রত্নাবলী ১২৬৪ সালে প্রস্তুত হয়। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র

সিংহ বাহাদুর ২০০ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগাছিয়ার বাটীতে ৬। ৭ বার উক্ত নাটক অভিনীত হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানাস্থানে অভিনীত হইতেছে।

*   *   *   *

'নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াশাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

*   *   *   *

খসড়া থেকে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হল। বর্জিত অংশেও মুখ্যত রামনারায়ণের বাকী নাটকগুলির কোনটি কবে রচিত বা প্রকাশিত এবং কোনটি কোথায় কতবার অভিনীত হয়েছিল তার পরিচয় লিপিবদ্ধ ছিল। রামনারায়ণ তাঁর জীবনী সম্পর্কে যেসব সন তারিখের উল্লেখ করেছেন তার কোথাও কোথাও কিছু গরমিল আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলির উল্লেখ করেছেন। তথ্য হিসাবে সেগুলি অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু রামনারায়ণের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নের জন্য সে সমস্ত আপাতত খুব জরুরি নয় বলে তার উল্লেখ করা হল না। রামনারায়ণের পক্ষে যে সংবাদটি তাঁর স্বরচিত জীবনীতে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি তা হল তাঁর মৃত্যুর তারিখ—১২৯২ সালের ৭ই মাঘ, ১৮৮৬, ১৯শে জানুয়ারী। সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে রামনারায়ণ তাঁর কর্মজীবন তথা চাকুরির বাইরে সমাজ সেবামূলক কোনো কাজকর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। বিষয়টি জরুরি ছিল। যেটুকু তিনি বলেছেন, তাতে স্বভাবতই মনে হয় তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর নাট্যাবলী সম্পর্কে এবং সেগুলির অভিনয় সম্পর্কে। আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়, তা হল তাঁর জন্ম, শিক্ষা এবং চাকুরিজীবন সবই সংস্কৃত আবহাওয়ায়। পিতা ৺রামধন শিরোমণি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিত। বাল্যে পিতৃহারা হয়ে তিনি মানুষ হয়েছিলেন অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের হাতে। তিনিও ছিলেন পণ্ডিতী ঐতিহ্যের ধারক। বাল্যশিক্ষা টোলে এবং পরে তা সম্পন্ন হয়েছিল সংস্কৃত কলেজে। সুতরাং রামনারায়ণের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের গৃহগত আবহাওয়া ছিল প্রাচীনপন্থী।

২

কিন্তু সে যুগটাই ছিল নতুনের আগমনের পদধ্বনিতে মুখর। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের, '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে',—বললেও যে 'প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনার মধ্য দিয়ে 'কি রাজনীতি কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা বিভাগ সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল'—তা সম্ভবত অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বীজের মধ্যে মহীরুহের সম্ভাবনা স্বীকার করলে ইতিহাসের পথ বেয়ে চলে যেতে হয় সুদূর অতীতে,—অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, গ্রাম কলিকাতা যখন নগর কলিকাতায় রূপ নিতে শুরু করেছে সেই সময়ে, কিম্বা আরো আগে যেদিন ইংরেজ কোম্পানী সাবর্ণ চৌধুরির কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি গ্রাম কিনে নিয়েছিল কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে—সেই দিনটিতে। পলাশির মাঠে বাঙালীর ভাগ্যবিপর্যয়ের পর বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিল। ক্রমে মুর্শিদাবাদ বিস্মৃতির অতলে চলে গেল, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জেগে উঠল কলিকাতা। এ ঘটনা, শকহুনদল মোগল-পাঠানের রাজপরিবর্তনের মত একটা গতানুগতিক ঘটনা মাত্র নয়। শাসনকর্তা পরিবর্তনের এই ঘটনার মধ্যদিয়ে বাংলার তথা ভারতের সমাজ সভ্যতার ইতিহাসে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। এক যুগের ক্রান্তি ও নতুন যুগের সূত্রপাত ত্বরান্বিত হল। গ্রামকেন্দ্রিক বাংলার তথা ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতি নগরকেন্দ্রিকতায় রূপ নিতে শুরু করল। এখানেই শুরু হল নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই নবযুগের সূচনা। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অবশ্য বিশ্বাস করেন, 'আধুনিক কালের খোলা হাওয়া অনেকদিন হইতেই বহিতে শুরু হইয়াছিল। সে হাওয়া শুধু যে ইউরোপীয় বণিকের পোতের পালে ঠেলা দিয়াই জানান দিয়াছিল তাহা নহে। মোগল শাসনে যত না হোক বৈষ্ণব ধর্মে খোলা মেলা শিক্ষায় শাস্ত্রের বাঁধন ও ব্রাহ্মণ সমাজের কেন্দ্র হইতে অসন্নিকৃষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের আর খুব দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া রাখিতে পারিল না।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস; সুকুমার সেন; প্রথম খণ্ড; অপরার্ধ, ৩য় সংস্করণ,)।

সূত্রপাতের দিনক্ষণ নিয়ে বিতর্ক যাই যাক, একথা নিঃসংশয়ে স্বীকৃত, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এই খোলা হাওয়ার আলোড়নে মুখর ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি সমস্ত দিকে যে মহাশূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার পটপরিবর্তন ঘটেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজ-আন্দোলনের প্রায় প্রতিটিরই সূচনা ঐ শতাব্দীর প্রথম পাদে বা কাছাকাছি সময়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

সিংহ বাহাদুর ২০০ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগাছিয়ার বাটীতে ৬। ৭ বার উক্ত নাটক অভিনীত হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানাস্থানে অভিনীত হইতেছে।

* * * *

'নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াশাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

* * * *

খসড়া থেকে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হল। বর্জিত অংশেও মুখ্যত রামনারায়ণের বাকী নাটকগুলির কোনটি কবে রচিত বা প্রকাশিত এবং কোনটি কোথায় কতবার অভিনীত হয়েছিল তার পরিচয় লিপিবদ্ধ ছিল। রামনারায়ণ তাঁর জীবনী সম্পর্কে যেসব সন তারিখের উল্লেখ করেছেন তার কোথাও কোথাও কিছু গরমিল আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলির উল্লেখ করেছেন। তথ্য হিসাবে সেগুলি অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু রামনারায়ণের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নের জন্য সে সমস্ত আপাতত খুব জরুরি নয় বলে তার উল্লেখ করা হল না। রামনারায়ণের পক্ষে যে সংবাদটি তাঁর স্বরচিত জীবনীতে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি তা হল তাঁর মৃত্যুর তারিখ—১২৯২ সালের ৭ই মাঘ, ১৮৮৬, ১৯শে জানুয়ারী। সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে রামনারায়ণ তাঁর কর্মজীবন তথা চাকুরির বাইরে সমাজ সেবামূলক কোনো কাজকর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। বিষয়টি জরুরি ছিল। যেটুকু তিনি বলেছেন, তাতে স্বভাবতই মনে হয় তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর নাট্যাবলী সম্পর্কে এবং সেগুলির অভিনয় সম্পর্কে। আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়, তা হল তাঁর জন্ম, শিক্ষা এবং চাকুরিজীবন সবই সংস্কৃত আবহাওয়ায়। পিতা ৺রামধন শিরোমণি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিত। বাল্যে পিতৃহারা হয়ে তিনি মানুষ হয়েছিলেন অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের হাতে। তিনিও ছিলেন পণ্ডিতী ঐতিহ্যের ধারক। বাল্যশিক্ষা টোলে এবং পরে তা সম্পন্ন হয়েছিল সংস্কৃত কলেজে। সুতরাং রামনারায়ণের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের গৃহগত আবহাওয়া ছিল প্রাচীনপন্থী।

২

কিন্তু সে যুগটাই ছিল নতুনের আগমনের পদধ্বনিতে মুখর। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের, '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে',—বললেও যে 'প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনার মধ্য দিয়ে 'কি রাজনীতি কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা বিভাগ সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল'—তা সম্ভবত অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বীজের মধ্যে মহীরুহের সম্ভাবনা স্বীকার করলে ইতিহাসের পথ বেয়ে চলে যেতে হয় সুদূঢ় অতীতে,—অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, গ্রাম কলিকাতা যখন নগর কলিকাতায় রূপ নিতে শুরু করেছে সেই সময়ে, কিম্বা আরো আগে যেদিন ইংরেজ কোম্পানী সাবর্ণ চৌধুরির কাছ থেকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনখানি গ্রাম কিনে নিয়েছিল কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে—সেই দিনটিতে। পলাশির মাঠে বাঙালীর ভাগ্যবিপর্যয়ের পর বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিল। ক্রমে মুর্শিদাবাদ বিস্মৃতির অতলে চলে গেল, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জেগে উঠল কলিকাতা। এ ঘটনা, শকহূনদল মোগল-পাঠানের রাজপরিবর্তনের মত একটা গতানুগতিক ঘটনা মাত্র নয়। শাসনকর্তা পরিবর্তনের এই ঘটনার মধ্যদিয়ে বাংলার তথা ভারতের সমাজ সভ্যতার ইতিহাসে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। এক যুগের ক্রান্তি ও নতুন যুগের সূত্রপাত ত্বরান্বিত হল। গ্রামকেন্দ্রিক বাংলার তথা ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতি নগরকেন্দ্রিকতায় রূপ নিতে শুরু করল। এখানেই শুরু হল নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই নবযুগের সূচনা। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অবশ্য বিশ্বাস করেন, 'আধুনিক কালের খোলা হাওয়া অনেকদিন হইতেই বহিতে শুরু হইয়াছিল। সে হাওয়া শুধু যে ইউরোপীয় বণিকের পোতের পালে ঠেলা দিয়াই জানান দিয়াছিল তাহা নহে। মোগল শাসনে যত না হোক বৈষ্ণব ধর্মে খোলা মেলা শিক্ষায় শাস্ত্রের বাঁধন ও ব্রাহ্মণ সমাজের কেন্দ্র হইতে অসম্নিকৃষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের আর খুব দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া রাখিতে পারিল না।'

সূত্রপাতের দিনক্ষণ নিয়ে বিতর্ক যাই যাক, একথা নিঃসংশয়ে স্বীকৃত, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এই খোলা হাওয়ার আলোড়নে মুখর ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি সমস্ত দিকে যে মহাশূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার পটপরিবর্তন ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজ-আন্দোলনের প্রায় প্রতিটিরই সূচনা ঐ শতাব্দীর প্রথম পাদে বা কাছাকাছি সময়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

সামাজিক রাজনৈতিক ঘোর দুর্দিনের অন্ধকারে সমগ্র জাতির আলোকের প্রার্থনা জ্যোতির কনকপদ্মের রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল রামমোহনের মধ্যে। এ যুগের প্রগতিশীল সমাজ আন্দোলনের প্রায় প্রতিটির সূত্রপাতেই রামমোহনের সংশ্রব ছিল ঘনিষ্ঠ।

হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলী থেকে বাদ পড়লেও রামমোহনই যে ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা, সে তথ্য সুবিদিত। প্রতিষ্ঠাতা যিনিই হোন, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, কলেজটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ দেশীয়দের নব্য শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল এর আগেই। জাতির উন্নতির জন্য কি কি বিষয়বস্তু এবং কি ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োজনীয় তা নিয়ে চিন্তা ও আলোড়ন চলছিল এই সময়ে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার নদীয়া, ত্রিহুত এবং কলিকাতায় আরো তিনটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ করলে রামমোহন এই পত্র লেখেন :

'* * . the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep the country in darkness if such has been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of government it will conseqently promote a more liberal and enlightened system of education embracing Mathematics, Natural philosophy, chemistry, Anatomy with other useful sciences.........'

শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় এই পত্রখানি 'নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি।' ব্রাহ্মণসুলভ প্রজ্ঞা ও ক্ষত্রিয়জনোচিত শৌর্যের সমন্বয়ে রচিত এই জাতীয় প্রতিবাদ বাঙ্গালীর ইতিহাসে আব একবার ধ্বনিত হয়েছিল কিছুকাল পরে বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে।

কেবল পুরুষদের শিক্ষাই নয়, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার বিষয়েও সচেতনতা দেখা দিয়েছিল শতাব্দীর প্রথম থেকেই। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে বেথুন কর্তৃক নারীশিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপনের অনেক আগেই রামমোহনের আত্মীয় সভা (১৮১৫), মিশনারী প্রগতিশীল সমাজনেতৃবর্গ, এমন কি রাজা রাধাকান্ত দেবও,—যিনি প্রায় সমস্ত প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনে বিরোধীপক্ষের নেতা ছিলেন,—স্ত্রীশিক্ষাপ্রসার বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সমাজের প্রগতি নির্ভর করে নারীদের অবস্থার উন্নতির উপর। নতুন সমাজগঠন প্রচেষ্টায় নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

এবং নারীদের অবস্থার উন্নতির বিভিন্ন আন্দোলন যুগপৎ চলে। এদেশেও তাই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সমসাময়িক কালেই সতীদাহ-নিবারণী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল আত্মীয় সভার মাধ্যমে, যদিও জনসাধারণ ও সরকারী মহলে সচেতনতা এর আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল। আইন পাশ হয়েছিল ১৮২৯, ৪ঠা ডিসেম্বর। আন্দোলন হিসাবে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন একটু বিলম্বিত বলে মনে হলেও এ সম্পর্কেও সচেতনতার সূত্রপাত অনেক আগে থেকেই ঘটেছিল। মতিলাল শীল, হলধর মল্লিক প্রভৃতি এবং ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যেকার আলোচনা এই সচেতনতার নিদর্শন। শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় আইন পাশ হল ১৮৫৬, ২৬শে জুলাই। কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ প্রথা বিলোপের সংগঠিত আন্দোলনও কিছু পরের হলেও—এর সম্পর্কে সচেতনতা ছিল বহুপূর্ববর্তী কাল থেকে এবং তা ছিল রীতিমত ব্যাপক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য়) তে এই সচেতনতার বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। এই সময়ের অনুরূপ আরো কয়েকটি আন্দোলনঃ (ক) বাল্যবিবাহ প্রথা রোধ, (খ) পণপ্রথা ও কন্যাবিক্রয় প্রথা বিলোপ, (গ) মদ্যপান নিবারণ, (ঘ) জাতিভেদ প্রথা দূর, (ঙ) হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা সংক্রান্ত আন্দোলন প্রভৃতি। এই সমস্ত সমাজ-আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় নয়। প্রসঙ্গত কেবল লক্ষণীয়, উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে সমগ্র দেশ কিভাবে সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথা ইত্যাদি দূরীকরণের জন্য সচেতন হয়ে উঠেছিল এই তথ্যটি। এর নিদর্শন হিসাবে, মনে হয়, কেবল একটিমাত্র বিষয় উল্লেখ করাই যথেষ্ট—তা হল ব্রাহ্মধর্মান্দোলন। এ যুগের সব থেকে বৃহৎ সমাজআন্দোলন সম্ভবত ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা। বাহ্যত একটি নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তন বলে মনে হলেও, সকলেই জানেন, এই ধর্মান্দোলনের পশ্চাতে মুখ্য প্রেরণা ছিল সামাজিক ও স্বাদেশিক চেতনা। প্রসঙ্গত, ব্রাহ্ম-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট।

৩

রামনারায়ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকালে শুধু শহর নগরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও আধুনিক যুগের নবচেতনার খোলা হাওয়ার স্পর্শ লেগেছিল। তাই আপাদমস্তক সংস্কৃত ও প্রাচীন আবহাওয়ায় লালিত ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পক্ষে সমাজ আন্দোলন ও প্রগতিশীলতার অগ্রপথিক হবার পথে কোনো প্রতিবন্ধক দেখা দেয় নি। অবশ্য এজন্যে কেবল দেশকালের বাতাবরণই নয়, ব্যক্তিগত উদার মানসিকতা ও প্রগতিপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গির অবদানও স্বীকার্য। অনুরূপ আর একটি

ব্যক্তিত্ব রামনারায়ণ তর্করত্ন। কর্মকাণ্ডের বিশালতায় অবশ্য তিনি বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ নন। তবুও সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ্য আবহাওয়ায় লালিত হয়েও তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের মতই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।

রামনারায়ণ যে বিদ্যাসাগরের মতই আধুনিকতা-বিরোধী ও রক্ষণশীল ছিলেন না, তা তাঁর ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে মতামতেও বোঝা যায়। ঠিক বিদ্যাসাগরের মত অত ব্যাপক না হলেও তিনি যে কিছু ইংরেজি চর্চা করে ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নবনাটকে 'নাগর' নামক নাগরিক নবযুবকের ইংরেজি-মিশ্র সংলাপে। বস্তুত রামনারায়ণ ইংরেজিকে ম্লেচ্ছভাষা বলে অবজ্ঞা না করে আধুনিক বিদ্যার আধার বলে তার চর্চা করার কথাই বলেছেন। মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত হিসাবে ছাত্রদের উপদেশার্থ যে 'প্রকাশ্য বক্তৃতা' তিনি করেন তাতে তিনি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষা চর্চায়ও উৎসাহ দিয়েছেন :

'এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধপ্রকার পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতিষ, দণ্ডনীতি ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধসকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষায় স্বরূপযোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট ২ গ্রন্থ স্বদেশীয়ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত।.........

......ফলত অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করিয়াও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ রাখা নিতান্ত উচিত।' (দ্র. সাহিত্যসাধক চরিতমালা; পঞ্চম সংখ্যক-গ্রন্থ, পৃঃ ১৯-২০)

রামনারায়ণের ব্যক্তিজীবনের বিস্তৃত পরিচয় সুলভ নয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনায় তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। তৎকালীন সমাজ-আন্দোলনের নানাদিকে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ কি ধরনের বা কতখানি ছিল তা সঠিক জানা না গেলেও, কিছু যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ প্রথাবিলোপ প্রভৃতি আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় যোগ ছিল, এমন ইঙ্গিত কেউ কেউ করেছেন। 'তখনকার দিনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত সংস্কারের পক্ষে যাঁহারা ছিলেন, বিবাহ বিষয়ক বিবিধ কুরীতির বিরুদ্ধে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বহুবিবাহের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। রামনারায়ণ তাঁহাদেরই একজন।' (দ্র. 'নাটুকে রামনারায়ণ' প্রবন্ধ, প্রিয়রঞ্জন সেন; প্রবাসী ৩১ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৮/আশ্বিন, পৃঃ ৭৫৫)। ইতিহাসে তাঁর

খ্যাতি 'নাট্টকে রামনারায়ণ' হিসাবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তাই নাট্যরচনায় তাঁর মূল্যবান অবদানই বুঝি কেবল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বস্তুত রামনারায়ণের নাটকগুলির নিরপেক্ষ নাট্যমূল্য কী মানের আপাতত সে বিচারে অগ্রসর না হয়েও একথা বলা চলে, সমাজচেতনতাই রামনারায়ণের নাটকগুলির অন্যতম প্রধান, সম্ভবত প্রধানতম, উপাদান। অর্থাৎ নাট্টকে রাম-নারায়ণ অভিধার প্রধান তাৎপর্য—সমাজ সচেতন, প্রগতিপরায়ণ, বাস্তব ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন রামনারায়ণ।

কোনো সমাজ প্রকৃষ্ট অর্থে উন্নত কিনা তার বিচার করতে হলে সেই সমাজের নারীদের অবস্থা কেমন—সেই বিচারই একমাত্র অপরিহার্য পদ্ধতি। নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে কোনো সমাজই কোনো দিন উন্নত হতে পারে নি। রাম-নারায়ণের প্রগতিশীলতার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা। তাঁর প্রথম রচনা 'পতিব্রতোপাখ্যানে' রামনারায়ণ লিখেছেন : 'এই বসুন্ধরা মধ্যে প্রায় যাবতীয় ভদ্রব্যক্তি এক্ষণে স্ব স্ব পুত্রকে সাদরে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছেন, পুত্রেরাও বিবিধ বিদ্যামন্দিরে সৎসঙ্গে সদালাপনে সময় যাপনপূর্বক অপূর্ব্ব প্রকৃতি হইতেছে কিন্তু এতদ্দেশীয় অভাগা যোষাজাতির প্রতি কেহই দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইহারা কন্যাসন্তানকে অনাস্থা করিয়া যে বিদ্যাশিক্ষা করান না এমত নহে অস্মদ্দেশীয়েরা অতি ধনলোভি ইঁহারা কহেন কন্যারা কি ধনোপার্জন করিবে যে তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান আবশ্যক.........বিদ্যার ঐ সকল ফল কি তাহারা দেখিতে পান না অতএব বিদ্যারসে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত রাখা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা না করাইলে অনেকানেক দুষ্ট দোষ আছে তন্মধ্যে এই এক প্রধান দোষ কহি।'

প্রথম দিকের রচনা হিসাবে এর বাক্যগঠনরীতি এবং বিরামচিহ্ন ব্যবহারে দুর্বলতা যাই হোক, এতে স্ত্রীজাতি সম্পর্কে রামনারায়ণের প্রগতিশীল দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। এমন দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন তাঁর নবনাটক ও কুলীনকুল সর্বস্বেও প্রাপ্তব্য। কুলীনকুল সর্বস্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলত কৌলীন্যপ্রথার বলি নারীদের দুরবস্থাই যদিও নাটকখানির মূল উপজীব্য, রামনারায়ণ কিন্তু প্রসঙ্গত অন্য নানাবিধ সামাজিক আচার-আচরণ, ভোজব্যবস্থা, পুরোহিত ও ঘটক সম্প্রদায়ের অসাধুতা ও অর্থলোভ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে নারীদের নানাবিধ দুর্দশা, কন্যাবিক্রয়, গর্ভে গর্ভে বিবাহ, ব্যভিচার এমন কি তাদের সাজসজ্জা প্রভৃতির উপরও আলোক-পাত করেছেন। নারীদের সামাজিক দুরবস্থা এবং তাদের মধ্যে যে ব্যভিচার

লক্ষ্য করা যায়, তার জন্যে তাদের শিক্ষায় সুযোগহীনতাই যে দায়ী, একথারও উল্লেখ তিনি করেছেন। চতুর্থ অঙ্কে ধর্মশীল ও তর্কবাগীশের কথোপকথনে ধর্ম্মশীলের উক্তি : 'বর্ত্তমানকালে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার সম্যক প্রথা নাই, সুতরাং তাহারা অন্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত করিতে পায় না, চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ যৌবনযাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবেচনাবিহীনা হইয়া স্বস্ব সমীহিত সাধনে যত্নবতী হয়, তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার তাহাদের ভ্রূভঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল হইয়া ওঠে।' ধর্ম্মশীলের কণ্ঠে ব্যক্ত রামনারায়ণের এই মন্তব্যে কেবল প্রগতিপরায়ণতা নয়, তাঁর বাস্তবদৃষ্টি ও উদারতার পরিচয়ও নিহিত।

৪

সমাজসচেতনতা রামনারায়ণের নাট্যজীবনের প্রধান উপাদান। এজন্যে তিনি সচেতন প্রচারেও বিমুখ ছিলেন না। তাঁর অনেক নাটকই ফরমায়েসি রচনা এবং নাটকের মধ্যেও সচেতন প্রচারমুখিতার নিদর্শন বিদ্যমান। (দ্রষ্টব্য নবনাটকে নটী ও সূত্রধারের সংলাপ)। কিন্তু তাই বলে তাঁর 'নাটুকে' অভিধা একেবারে মিথ্যা নয়। আধুনিক যুগের বিচারে তাঁর নাটকে নাট্যগুণের অনেক অভাবই পরিলক্ষিত হবে এবং নিরপেক্ষ নাট্য বিচারে নাটকগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে। তবু সে যুগের বিচারে তিনি রীতিমত জনপ্রিয় ও সার্থক নাট্যকার ছিলেন। বস্তুত জাতির সে যুগের নাট্য সংস্কারই ছিল অন্য রকমের। যাত্রা ও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছিল জাতির নাট্যসংস্কারে মজ্জাগত। তাই আধুনিক বিচারে তাঁর নাটকে যে সমস্ত ত্রুটি ধরা পড়ে, সে যুগে তা ধরা পড়ত না। বরং সেই ত্রুটিগুলিই পরিচিত গুণ বলে মনে হত।

রচিত নাট্য সংখ্যার দিক দিয়েও তাঁর নাটুকে অভিধা অসঙ্গত নয়। তাঁর কনিষ্ঠ সমসাময়িক মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাট্যসংখ্যা [যথাক্রমে ৬ এবং ৮] এর তুলনায় তাঁর রচিত নাট্যসংখ্যা রীতিমত অভিজাত। [তাঁর রচিত নাট্যসংখ্যা ১৩; 'সুনীতি সন্তাপ' নামক নাটক প্রকাশিত হয় নি। এটিকে হিসাবে ধরলে মোট সংখ্যা ১৪। প্রকাশিত ১৩টি নাটকের মধ্যে অনুবাদ ৪ খানি, পৌরাণিক আখ্যানমূলক ৪ খানি, স্পষ্টত সমাজ সমস্যামূলক দুখানি এবং প্রহসন তিনখানি।] প্রকাশ্য মঞ্চাভিনয়ে তাঁর নাটকই ছিল সে যুগে সব থেকে সফল ও জনপ্রিয়। তৎকালীন শৌখীন রঙ্গমঞ্চে (জোড়াশাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মঞ্চ সমেত) কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব ও নবনাটক অনেকবার অভিনীত হয়েছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর নবনাটক

যেমন কর্ম তেমনি ফল, চক্ষুদান, রত্নাবলী, মালতীমাধব, রুক্মিণীহরণ, উভয়সংকট প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন প্রত্যেকটি একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস; ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। নাট্যকার হিসাবে তিনি যে কেবল জনপ্রিয়তাই অর্জন করেছিলেন তাই নয়, তৎকালীন বিদগ্ধজনের কাছ থেকেও সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। বেঙ্গল ফিল হার্মোনিক এ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ডিরেক্টর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতি তাঁকে 'হরকুমার ঠাকুর কনক কেয়ূর' প্রদান করেছিলেন। সঙ্গে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি এবং মানপত্র দিয়েও সম্বর্ধনা করেছিলেন। মানপত্রে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের কারণ হিসাবে তাঁর নাট্যগুণাবলীই মুখ্যত উল্লিখিত ছিল: 'in Consideration of his Proficieney in dramatic writing and his being the first writer of Bengali Drama in a systematic form' [বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্র. সাহিত্য সাধক চরিতমাল, ৫ম সংখ্যক গ্রন্থ]। এখানে অবশ্য systematic form অর্থাৎ বিধিবদ্ধভাবে বাংলা নাটক রচনায় এঁকে প্রথম নাট্যকার বলা হয়েছে। কিন্তু সে যুগে অনেকেই এঁকে 'প্রথম বাংলা নাট্যকার' বলে উল্লেখ করেছেন। ঠিক ঐতিহাসিকভাবে 'ইনি প্রথম বাংলা নাট্যকার' নন। তবে ইনিই বাংলার প্রথম মৌলিক সামাজিক নাট্যকার এবং এঁর নাটকই প্রথম মঞ্চাভিনীত মৌলিক নাটক।

৫

নাটক জীবনের দর্পণ। সমাজকে বাদ দিয়ে জীবনের কোনো অস্তিত্ব নেই। সাহিত্যের সব শ্রেণীর মধ্যে নাটকই বোধ হয় সব থেকে বেশি সমাজ-সচেতনতার দায়িত্ব পালন করে থাকে। নাট্যকলাবিধির প্রয়োগ কুশলতার দিক দিয়ে আগেই বলেছি, রামনারায়ণের স্থান খুব উচ্চে নয়। কিন্তু মূলগত সমাজ চেতনাই তাঁকে নাট্যরচনার পথে টেনে এনেছিল, এ অনুমান বোধ হয় মিথ্যা নয়। তাঁর হাস্যরস প্রবণতাও এই অনুমানের সমর্থক। হাসি চিরকালীন বৃত্তি। কিন্তু হাস্যভিত্তিক সামাজিক প্রহসন একটি বিশেষ যুগেই রচিত হয়,—অন্তত বিশিষ্ট একটি ধারা হিসাবে কোনো যুগেই এর প্রাদুর্ভাব হয়। কেন একটি বিশেষ যুগে সামাজিক প্রহসন বা নকশা জাতীয় রচনা প্রাদুর্ভূত হয়,—এ প্রশ্ন সমীচীন। কোনো অবক্ষয়ের যুগের পর জাতীয় জীবনে যখন নতুন চেতনার সূত্রপাত হয় তখন প্রথমত দেখা দেয় একটি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্বভাবতই থাকে

অতিরঞ্জন, বিকৃতি ও অসঙ্গতি। এই প্রতিক্রিয়াই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে প্রহসনাত্মক নক্‌শাজাতীয় রচনায়। কারণ অসঙ্গতিই হাসির প্রধান উৎস এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনুস্যূত অসঙ্গতির চিত্র তখন সমাজে থাকে প্রচুর। এই সব রচনায় রচয়িতার ভূমিকা দ্রষ্টার মত। তাঁরা এই সব সমাজ চিত্র, বিশেষ করে এর মধ্যে যে সব বিকৃতি ও অসঙ্গতি থাকে তা দেখেন এবং তা প্রকাশ করেন। আর সেই প্রকাশের মধ্যে অনেক সময়েই থাকে কিছু ব্যঙ্গের হুল। প্রথম যুগের সমাজ চিত্রমূলক নাটকগুলি তাই প্রায়শ প্রহসন বা প্রহসনাত্মক।

রামনারায়ণেব সমাজচেতনাই তাঁর মধ্যে জন্ম দিয়েছে প্রহসন প্রবৃত্তির। রামনারায়ণের নাটকগুলির মধ্যে তিনখানি স্পষ্টত প্রহসন শ্রেণীর। তাঁর মৌলিক নাটকগুলিতেও তাঁর প্রহসন প্রবৃত্তির প্রকাশ রীতিমত উজ্জ্বল। কুলীন-কুল সর্বস্ব বিশ্লেষণ করলেই এই বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। হাস্যরসের সব কটি শ্রেণীই (wit, fun, satire humour) এই গ্রন্থখানির মধ্যে বিদ্যমান। অবশ্য গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ প্রহসন বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। হাস্য উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও শ্রেণীগতভাবে এটি একখানি সামাজিক নকশা নাটক। (বিস্তারিত আলোচনা নাটক বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)। আবার সমালোচক গ্রন্থখানি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন : 'সামাজিক দুর্নীতি দূর করিবার জন্য রচিত হইলেও ইহা বিয়োগান্ত নহে,—ইহার শেষভাগে 'বিবাহ নির্বাহ' হইতেছে। ইহাতে হাস্যরসের উপাদান এত প্রচুর যে, কুলীনকুলের দুর্দশার ছবিই শুধু লেখকের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, কৌলীন্য ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রচণ্ড অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তর্করত্ন মহাশয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই।' [প্রিয়রঞ্জন সেন ; পূর্বোক্ত নাটুকে রামনারায়ণ প্রবন্ধ : প্রবাসী, ১৩৩৮, আশ্বিন , পৃঃ ৭৫৬]—সেটাও সর্বাংশে সত্য নয়। আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে নাটকটি 'বিয়োগান্ত নহে'—এ উক্তি ঠিক। কারণ শেষ পর্যন্ত চারটি কুলীন কন্যার তো বিয়ে হয়েই গেল। কিন্তু এ বিয়ে কি মিলনের প্রতীক! যে বিয়েতে মন্ত্র উচ্চারিত হয় : 'ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী'। এবং 'শ্মশানানল দগ্ধোহসি পরিত্যক্তোহসি বান্ধবৈঃ'। গাঁটছড় বাঁধার পর যেখানে আশীর্বাদ উচ্চারিত হয় : 'সর্বনাশো মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈবচ সর্বাঙ্গে ধবলাকারঃ অল্পায়ুর্ভব সম্প্রতি।' যেখানে বিবাহ নির্বাহে নটের উক্তি : 'বিবাহ নির্বাহ হলো হরি হরিবোল।' সেখানে সেই বিবাহ নির্বাহকে মিলনের প্রতীক এবং তার জন্য নাটকটি বিয়োগান্ত নয় বলে মনে করার কি কিছু কারণ

আছে? সমালোচকের বক্তব্যের শেষাংশ অবশ্য ঠিক। সত্যই তর্করত্ন মহাশয় হাস্য সংবরণ করতে পারেন নি।

রামনারায়ণের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হাস্যরস রসিকতা। তাঁর জীবনের সামান্য পরিচয় এখানে ওখানে যেটুকু পাওয়া যায় তাতে স্বভাবের এই দিকের অর্থাৎ witty বাক্যপ্রয়োগ-নিপুণতার উল্লেখ আছে। ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতীতে মন্মথনাথ ঘোষের লেখা 'সেকালের গল্প' নামক রচনায় প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের অন্তরঙ্গ জীবনের কিছু পরিচয় আছে। রামনারায়ণের বাক্‌চাতুর্য এবং রসিকতা সম্পর্কে মন্মথ নাথ কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তার থেকে, রচনাটি এখন সুলভ নয় বলে, প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

রামনারায়ণের অন্যতম শিষ্য সুলেখক পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে শুনে মন্মথনাথ রামনারায়ণ সম্পর্কে লিখেছেন যে, উনি একদিন ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেবের) বাড়ীতে ব্রাহ্মণ বিদায় উপলক্ষে গিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণকে তিন টাকা বিদায় দিয়ে রামনারায়ণকে দু'টাকা দিলে তিনি বললেন, 'মহাশয় আপনি পূর্ব ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আমার প্রতি পক্ষপাত করিলেন। আমার প্রতিও নেত্রপাত করুন না?' ছাতুবাবু প্রীত হলেন কিন্তু আমোদ করতে বললেন, 'তর্করত্ন মহাশয় ত্রিনেত্র কেবল মহাদেবেই সম্ভবে, মানুষের ত ত্রিনেত্র নাই।' তর্করত্নের উত্তর: 'আপনাকে ত আমরা আশুতোষ বলিয়াই জানি। ত্রি নেত্র কেন? পঞ্চানন আশুতোষের পঞ্চমুখে পঞ্চদশ নৃত্য (নেত্র?) আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।'

ছাতুবাবু তাঁকে পঞ্চদশ মুদ্রা দিলেন।

রামনারায়ণ একদিন কোনো ধনীব বাড়ীতে গিয়ে দেখেন তাঁরা নিষিদ্ধ খানা-পিনা করছেন। তাঁরা বললেন, আসুন খানা খান। তর্করত্ন উত্তর দিলেন! আপনারা শহুরে মানুষ খানা খান। আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক খানায় মল-মূত্রাদি ত্যাগ করে থাকি।

রামনারায়ণ একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে গেলে তাঁকে দেখে সকলে বলে ওঠেন, 'ওরে কে আছিস, তর্করত্ন মহাশয় আসিয়াছেন (বসিবার জন্য) চৌকী-দে।' রামনারায়ণ বললেন, 'হা কপাল! আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, চোর নহি, ডাকাত নহি, আমাদের ও চৌকী দিতে হইবে?'

রামনারায়ণের এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য তাঁর নাট্যবাণীতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

৬

নাটক একটি যৌথশিল্প। এর সাহিত্যিক দিকের সঙ্গে অভিনয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মঞ্চ ও অভিনয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলে তাই সার্থক নাটক রচনা সম্ভব নয়। নট-নাট্যকার বলতে যা বোঝায় রামনারায়ণ তা ঠিক ছিলেন না। তবে মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। নিজের নাটক অভিনীত হলে তিনি দেখতে যেতেন এবং সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় দেখলে তিনি উল্লাস ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হতেন না। এ সম্পর্কে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছেন: গ্রন্থ রচনা ভিন্ন শুদ্ধ অভিনয়ে যে তর্করত্ন মহাশয়ের অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল তাহা হরিণাভিতে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি। উক্ত গ্রামে ইংরেজী ১৮৬২ সালে যে বঙ্গ নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই একরূপ তাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং উহার রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটক রত্নাবলীর অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। তিনি অভিনয়ের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দিতেন এবং আখড়ায় কিভাবে অভিনয় করিতে হইবে, ভাবভঙ্গী পর্যন্ত শিখাইতেন, অভিনয়ের জন্য - ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনাও তাঁহার দ্বারাই হইত।' [পূর্বোক্ত 'নাটুকে রামনারায়ণ প্রবন্ধ; প্রবাসী, ১৩৩৮, আশ্বিন, পৃঃ ৭৬১]।

অভিনয়ের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ যোগ তাঁর মনে যে অভিনয় সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ তাঁর অনুবাদ নাটকগুলির মধ্যেও বিদ্যমান। সংস্কৃত থেকে হুবহু অনুবাদ করলে তা তৎকালীন যুগে অভিনয়োপযোগী হবে না বলে তিনি অনুবাদের সময় কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। রত্নাবলীর বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন, 'বিশেষতঃ এইক্ষণে নাটকাভিনয় বিষয়ে যে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে তাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত থাকায় এ গ্রন্থ তদুপযোগী করণ মানসে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি...।' বেণী সংহার দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনেও তিনি লিখেছিলেন': 'সম্যকরূপে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত এবার অনেক পরিবর্তন করিলাম...।'

রামনারায়ণ কথিত এই অভিনয় কিন্তু প্রাচীন যাত্রাভিনয় ছিল না, ছিল মঞ্চাভিনয়। একথা যদিও স্বীকার্য,' রামনারায়ণের নাটকে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক ও যাত্রাভিনয়ের, এমনকি মঙ্গলকাব্য পাঁচালিরও প্রচুর প্রভাব বিদ্যমান, যে প্রভাব মধুসূদনও সচেতন প্রয়াস সত্ত্বেও পূর্ণত কাটিয়ে উঠতে পারেন নি,—তবুও রামনারায়ণ যে আধুনিক মঞ্চাভিনয়কেই পছন্দ করতেন, যাত্রায় তাঁর অভিরুচি

নেই,—একথা রত্নাবলীর বিজ্ঞাপনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গেছেন। এখানেও রামনারায়ণের দৃষ্টির আধুনিকতা স্বীকার্য। নাট্য প্রকরণের পাশ্চাত্য রীতির আধুনিকতা অবশ্য তাঁর অধিগত ছিল না। তাই তাঁর নাটকগুলির গঠনে, অঙ্কদৃশ্য বিভাগে, সংস্কৃত রীতিরই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে যেটুকু সচেতনতার পরিচয়, প্রয়োগে না হলেও অভিপ্রায়ে, তিনি দিয়েছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য।

শর্মিষ্ঠা রচনার পর মধুসূদন এর ভাষা প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে মন্তব্য করে-ছিলেন, কবি এসে নাট্যকারের হাত চেপে ধরেছে। রামনারায়ণের ভাষা প্রসঙ্গেও সেরকম বলা চলে যে সংস্কৃত পণ্ডিত এসে নাট্যকারের হাত চেপে ধরেছিল। তাই বলে নাটকীয় সংলাপ রচনায় রামনারায়ণের কৃতিত্ব কিন্তু একেবারে অবহেলার যোগ্য নয়। নারীর মুখের ভাষা, নাগরিক নব্য যুবকের ইংরেজি মিশাল ভাষা, অশিক্ষিত মাইন্দারের স্থূল ভাষ, শিক্ষিত ভদ্রলোকের শুদ্ধ ভাষা অর্থাৎ চরিত্রানুযায়ী সংলাপের পার্থক্য,—নাটকীয় সংলাপের এই মৌলিক তত্ত্বটি রাম-নারায়ণ অবগত ছিলেন ঠিকই তবুও প্রয়োগে সর্বদা তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। বিশেষত নাটকে ভদ্রলোক চরিত্রের সংখ্যাধিক্যের জন্য সমাসবদ্ধ শব্দবহুল, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ ভারাক্রান্ত সংলাপ, প্রকৃতি বর্ণনায় সংস্কৃতানুসারিতা, মাঝে মাঝে পয়ার ত্রিপদীর ব্যবহার তার নাটকগুলির সংলাপের পরম দুবলতা।

আগেই বলেছি আধুনিক অথবা যুগনিরপেক্ষ নাট্যবিশ্লেষণের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে রামনারায়ণের সৃষ্টিগুলি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতিভাত হবে। তবুও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রামনারায়ণের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার যিনি তৎকালীন যুগচেতনাকে নাট্যসৃষ্টির বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে বাস্তব ও প্রগতিশীল দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে সঠিক পদক্ষেপে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নাটকে যেসব দুর্বলতা আছে উল্লেখের সময়ে অবশ্যই আমাদের সেই যুগটিকে এবং বাঙ্গালীর তৎকালীন নাট্য-সংস্কারের কথাও স্মরণ রাখতে হবে। যাত্রা, পাঁচালি এবং সংস্কৃত নাটকের অনুবাদই ছিল তখনকার বাঙ্গালীর আসর-অনুষ্ঠানের প্রধান উপাদান এবং ঐতিহ্য। রামনারায়ণ সামান্য কিছু ইংরেজি শিখলেও পাশ্চাত্য নাট্যধারায় অনুস্যূত হবার যোগ্যতা অর্জন করেন নি। বাংলা লিখিত গদ্য তখন বিদ্যাসাগরের হাতে কিছু লালিত্য অর্জন করলেও সংলাপের সাবলীলতা ও সজীবতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই

তখন সৃষ্টি হয় নি। জীবন্ত সংলাপ বলতে যা বোঝায় তা বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম সার্থকভাবে পাওয়া গেল মধুসূদনের প্রহসনে। এক্ষেত্রে মধুসূদন যেন অলোক প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। তবু তিনিও কিন্তু তাঁর নাটকগুলিতে সার্থক সংলাপের নিদর্শন উপস্থিত করতে পারেন নি। দীনবন্ধুও তাঁর প্রহসনগুলিতে রামনারায়ণ থেকে সুন্দর সংলাপের ব্যবহার করলেও তাঁর সার্থকতার মাত্রাও খুব উচ্চাঙ্গের নয়। মনে রাখতে হবে, মধুসূদন এবং দীনবন্ধু উভয়েই পাশ্চাত্য সাহিত্য ধারায় রীতিমত অভিষিক্ত এবং রামনারায়ণের পরবর্তী। তাই দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক নকশা প্রহসনের যে ধারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে কুলীনকুলসর্বস্বকে অবলম্বন করে তার পথিকৃতের গৌরব রামনারায়ণ তর্করত্নেরই প্রাপ্য—তাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকীতে যদি এ দাবী করা হয়—তা নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না।

শ্রীসত্যব্রত দে

জীবনীকথা

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর চব্বিশ পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রামধন শিরোমণি। শৈশবে পিতা-মাতাকে হারিয়ে রামনারায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ও তাঁর স্ত্রীর স্নেহে লালিত-পালিত হন। অল্পবয়সেই তিনি "ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগ—মোট দশবৎসর তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন (১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২রা মে)। দুই বৎসর পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন। এখানে তিনি একাদিক্রমে দীর্ঘ বাইশ বছর (১৫ জুন ১৮৫৫—৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) বিভিন্ন পদে অধ্যাপনার পর অবসর গ্রহণ করেন।

কিন্তু রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিলেও কর্মজীবন থেকে নয়। তিনি নিজগ্রামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করে দেশ-বিদেশের ছাত্রদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারী তিনি উদরী রোগের আক্রমণে পরলোক গমন করেম।

রচনাবলী

১। পতিব্রতোপাখ্যান (জানুয়ারী ১৮৫৩)—

রংপুর জেলার কুণ্ডী নিবাসী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চতুর্ধরীন বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে উক্ত নামে এক রচনা প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল—"স্ত্রীজাতি স্বপতির মতাবলম্বিনী হইয়া, দেহযাত্রা নির্বাহকরণে, দম্পতী প্রীতিবর্দ্ধন হওতঃ সৃষ্টিপ্রবাহের প্রতি প্রতিবন্ধকতা চ্ছেদন পূর্বক কি নিগূঢ় ইষ্টফলোৎপত্তি হইতে পারে? তদন্যথাতেই বা কি অনিষ্টতা অথবা শান্তির ব্যাঘাত জন্মে? বিবিধ প্রমাণ ও বিবিধ সদযুক্তির দ্বারা প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ন করা প্রশ্নকর্তার মূলাভিপ্রেত।" রামনারায়ণের রচনাটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে ৫০ টাকা পারিতোষিক পায়। এই প্রবন্ধে রামনারায়ণ স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার অনুকূলে দৃঢ়মত অভিব্যক্ত করেন।

২। প্রকাশ্য বক্তৃতা (অক্টোবর ১৮৫৩, পৃঃ ২০)

মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তৃতা। এই গ্রন্থে রামনারায়ণ ইংরাজী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।...এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধপ্রকার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দণ্ডনীতি, ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষায় স্বরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট ২ গ্রন্থ সকল স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকারে উপকৃত হইয়া ঐ অনুবাদকর্ত্তাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া চিরকাল স্ব স্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় রাখিবেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যোপার্জন সার্থক হইবে।" রামনারায়ণ একদিকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে মাতৃভাষা অনুশীলনের সাথকতা বিষয়ে দ্বিধাহীন মত পোষণ করতেন।

৩। কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক (১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ, পৃ. ১২৭) বিস্তারিত বিবরণ নাট্য-আলোচনায় দ্রষ্টব্য)

৪। বেনীসংহার নাটক (১৮৫৬)—অনুবাদ।

৫। রত্নাবলী নাটক (১৮৫৮)—অনুবাদ। এই নাটকটি পাইকপাড়া রাজাদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে ৩১ জুলাই ১৮৫৮-তে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। এখানে নাটকটি ৬।৭ বার অভিনীত হয়েছিল। ইংরেজ দর্শকদের বুঝবার সুবিধার জন্য এটির ইংরেজী অনুবাদ করানো হয়েছিল—অনুবাদক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৬। অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক (১৮৬০)—অনুবাদ।

৭। যেমন কর্ম তেমনি ফল (প্রহসন,)

৮। নবনাটক (১৮৬৬)—বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ে এ নাটক রচিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় 'অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব অনুভব করিয়া' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। পরে সে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে, রামনারায়ণের উপর এই নাটক রচনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়। রামনারায়ণ এই নাটক রচনা করে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দু'শত টাকা পুরস্কার পান।

৯। মালতীমাধব নাটক (১৮৬৭)

১০। উভয় সংকট (প্রহসন, ১৮৬৯)

১১। চক্ষুদান (প্রহসন) (১৮৬৯)
১২। রুক্মিণীহরণ নাটক (১৮৭১)
১৩। স্বপ্নধন নাটক (১৮৭৩)
১৪। ধর্ম্মবিজয় নাটক (১৮৭৫)
১৫। কংশবধ নাটক (১৮৭৫)

এছাড়া রামনারায়ণ সংস্কৃতে মহাবিদ্যারাধন (দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা), আর্যাশতকম, দক্ষযজ্ঞম্ প্রভৃতিও রচনা করেন। মালতীমাধব নাটকটিও রামনারায়ণ অনুবাদ করেছিলেন।*

প্রধানত, নাট্যকার রূপেই রামনারায়ণের খ্যাতির বিস্তৃতি। মৌলিক ও অনুবাদ—দু ধরণের নাট্যরচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর প্রথম নাটক "কুলীন কুল-সর্বস্ব"। এই নাটকখানিই রামনারায়ণকে খ্যাতির পাদপ্রদীপের সামনে এনে দেয়। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে জে.সি. গুপ্তের "কীর্তি-বিলাস এবং তারাচরণ শিকদারের "ভর্দ্রার্জুন' এবং ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং ইতিহাস বিচারে রামনারায়ণের "কুলীনকুল সর্বস্ব" প্রথম নাটক নয়। কিন্তু প্রখর সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে রচিত "কুলীনকুল সর্বস্ব" নানাদিক থেকেই অগ্রগণ্যের ভূমিকা পালন করেছে। এটি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রথম বাংলা নাটক—সমাজ সমস্যা অবলম্বনেও এটিই প্রথম রচিত বাংলা নাটক। সেকালে 'কুলীনকুল সর্বস্ব' যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা সত্যই বিস্ময়কর। রামনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা ছিল না। কিন্তু তাঁর মনটি ছিল প্রগতিশীল। তাই নতুন যুগভাবনার বাত্যাতরঙ্গ তাঁর মনকে নিশ্চিতই আলোড়িত করেছিল। তাই তিনি মাতৃভাষার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি ভাষা শিক্ষারও যাথার্থ্য ও প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই প্রগতিশীল চিন্তাধারা সক্রিয় থেকেছে। তাই তিনি বহুবিবাহ সমস্যা, কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা বিষয়ে বিদ্রূপাতক মনোভঙ্গি প্রকাশে দ্বিধা করেননি। রামনারায়ণ একদিকে মৌলিক নাটক রচনা, অন্যদিকে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে নাট্যভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছেন। বাস্তব জীবনধর্মী চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতাও অনস্বীকার্য।

সংলাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও দেখা যায়—চরিত্রানুযায়ী সংলাপ এবং সংলাপানুযায়ী চরিত্র সৃষ্টি করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে রামনারায়ণ এ বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা

* উপর্যুক্ত তথ্যাদি 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' (১ম খণ্ড) থেকে গৃহীত হয়েছে।

গ্রহণ করেছেন। সংস্কৃত পণ্ডিত 'নাটুকে' রামনারায়ণ "কুলীনকুল সর্বস্ব" নাটকের গঠনরীতিতে সংস্কৃত নাট্যানুসারী হলেও 'নব নাটকে' তিনি ইংরেজি নাটকের অনুসরণে অঙ্কের মধ্যে গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যের ব্যবহার করেছেন।

রামনারায়ণ কয়েকটি প্রহসন রচনা করেছিলেন—যেমন কর্ম তেমনি ফল, উভয় সংকট, চক্ষুদান প্রভৃতি। এ সবের মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্র দিয়ে তিনি সমাজের ও জীবনের নানা অসংগতিকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। পাশ্চাত্ত্য ভাব-বিলাসের উন্নাসিকতায় নয়, হৃদয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতায় ও সুস্থ জীবনের প্রতি গভীর আসক্তিতে রামনারায়ণ নাট্যক্ষেত্রে সূচিত করেছিলেন নতুনের আগমনী কাল। আর এ কারণেই রামনারায়ণ বাংলা নাট্যক্ষেত্রে চির-নমস্য ব্যক্তিত্ব।

কাহিনী সূত্র

প্রস্তাবনা অংশে নান্দী, সূত্রধার কৃত নাট্যনির্দেশ—"পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক সঙ্গীত সামাজিকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারেনা।···শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মধুর সাধুভাষায় যে "কুলীনকুল সর্বস্ব" নামক অপূর্ব নাটক রচনা করিয়াছেন, তৎপ্রস্তাব দ্বারা সমাহিত সিদ্ধ করিব।" এরপর সূত্রধার ও নটির কথোপকথনের মাধ্যমে কন্যা-বিবাহ সমস্যা উল্লিখিত।

মূল নাট্যারম্ভে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুলধন মুখোপাধ্যায়ের কথোপকথন। কুলপালক প্রধান কুলীন। উপযুক্ত সমযোগ্য পাত্র না পাওয়ায় তাঁর কন্যাদের বিবাহ হয়নি। তাই তাঁর উক্তি····"তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি।··· বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি।' বন্ধু কুলধনের সঙ্গে কৌলীন্যপ্রথায় বিবাহ-সমস্যা নিয়ে আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে জানা যায় যে, তিনকন্যার বিবাহ-ব্যাপারে কুলপালক বিব্রত। অনৃতার্য ও শুভাচার্য নামক দুই ঘটককে তিনি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে দেশে দেশে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তারা এখনো কোন খবর নিয়ে ফিরে আসেনি।

দ্বিতীয় অঙ্ক :

ঘটক চিত্র। শুভাচার্য শাস্ত্রজ্ঞ ঘটক, অনৃতাচার্য মূর্খ, অশিক্ষিত, কিন্তু ধড়িবাজ ঘটক। এই দুইয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে দুইজনের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। পয়সার লোভে ধূর্ত ঘটক যে কত অনৈতিক কর্ম করে, সে দৃষ্টান্ত এখানে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে—কুলপালক ও অনৃতাচার্যের কথোপকথন। কুলপালকের কন্যাদের জন্য অনৃতাচার্য বর ঠিক করেছে। কিন্তু পয়সা মুচড়ে নেওয়ার জন্য খবর দিতে সে টালবাহানা করে। সে শেষপর্যন্ত জানায় "বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য, আর এমন অধিক বয়সই বা কি? সেই ষষ্ঠীর বৎস এই ষষ্টিবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমার কি অদৃষ্ট, শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে। অতএব তুমি সেই সর্বগুণালঙ্কৃত কুলীন মহামানী কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও।" কুলপালক রাজি হয়ে ঘটককে বিবাহের দিন স্থির করতে বলেন।

তৃতীয় পর্বে—ঘটক ও গ্রহাচার্য কথোপকথন। ঘটক অশালীন চাতুরিপূর্ণ বাক্যজালে গ্রহাচার্যকে স্বমতে আনতে চেষ্টা করে। সে শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে 'তুই দূর হ, আর দিন দেখিতে হইবে না।" বলে তাকে তাড়ায়। আগামীকাল বিবাহের দিন ঘটক নিজেই স্থির করে। যদিও সে মনে মনে জানে যে, "শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরা ত সর্বদাই বৈধব্য-বেদনা সহ্য করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি? অতএব, ইহাকে বাক্‌ছলে প্রতারিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা করি।"

চতুর্থ পর্বে—ঘটক অনৃতাচার্য্য ও কুলপালক-এর মধ্যে কথোপকথন। কুলপালক জানতে চান—'কল্য কি দিন নাই?' অনৃতাচার্য তাঁকে বুঝান—'কল্য উত্তম দিন।' তাঁর যুক্তি—যদি কল্য উত্তম দিন না হইত তাহা হইলে এতদ্দেশীয় রাজা অমরনাথ বাহাদুর নিজ পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেন না।' এত অল্পসময়ে বিবাহ আয়োজন কি ভাবে সম্ভব, এর উত্তরে ঘটক জানান—'আয়োজনের এত বাহুল্য কি?' বরযাত্র, কন্যাযাত্র প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি—'বরযাত্র আমি, কন্যাযাত্র তুমি, আর পৌরোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম, তাহা আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে।' কুলপালক টিপ্পনি কাটেন—'তবে নাপিতের কর্মও কি আপনি করিবেন?' আগামীকাল বিবাহের দিন স্থির হলো। কুলপালক বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন।

তৃতীয় অঙ্ক :

কুলপালকের পত্নী মেয়েদের বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন করতে সারারাত জেগেছে—'সমস্ত রাত উয্‌যুগ সংযুগ কত্যে জেগেছিলাম।' তাই তার উঠতে বেলা হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। এমন কি যে মেয়েদের বিবাহ, তাদেরই পর্যন্ত বিয়ের কথা বলা হয়নি—'আগে মেয়েদের ডেকে এ সম্বাদ বলি, তাদের 'বে' তারাও এখন টের পায়নি।' ব্রাহ্মণী তিন মেয়েকে ডেকে তাদেরকে বিয়ের

সংবাদ দেন। তিন কন্যার মধ্যে বয়সানুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। জাহ্নবী এ সংবাদেও বিষন্না, শাম্ভবী আশ্চর্যান্বিতা, কামিনী উৎসুকা, কিশোরী সরলা, অনভিজ্ঞা।

দ্বিতীয় পর্ব—নাপিতানী রসিকা ও দেবল। রসিকা সার্থকনাম্নী। "নবীন যুবতী আমি / মরেছে আমার স্বামী / তবু কভু দুঃখ নাহি জানি।" দেবলের ও তার বাক্‌চাতুর্যপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে জানা যায়, বাড়ুজ্যে বাড়িতে মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সে কামাতে যাচ্ছে। মেয়েদের জল সৈতে যাবার জন্য সাজগোজের সংবাদও তার কথায় জানা গেল।

তৃতীয় পর্বে—কামিনীগণ। বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে তারা বাড়ুজ্যে বাড়িতে চলেছে। কিন্তু বিয়ে বাড়িতে কোন ঘটা নেই। ব্রাহ্মণীর কথায় "কুলীনের মেয়ের বে ঘটাই ভার, আবার ঘটা পাব কোথা বোন।" মেয়েদের কথায় বরের বিবরণ—'তার জন্যে জলসৈতে হবেনা, তাকে জল সৈ কল্লিই ভালো হয়।' তাই চঞ্চলা যখন বলে—'ওলো কুলবালা কুলো নে লো মাথে করি। / জল সহিবারে সবে বল হরি হরি॥'—শুভকর্মে এ অমঙ্গলে কথার মধ্য দিয়েই এই বিবাহের অন্তরালের বেদনা ও কারুণ্য যথাযথ প্রকাশ পায়। বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে সমাগতা অপ্রাপ্তবয়স্কা নারী, বহুপত্নীক স্বামীর পত্নী, অবিবাহিতা বৃদ্ধা, অবিবাহিতা যুবতী, বিয়ের পরেই বিধবা নারী—প্রভৃতি নারীদের কথায় একদিকে তাদের করুণ হৃদয়-বেদনা, অন্যদিকে কৌলীন্যপ্রথার বিষময় চিত্র প্রতিফলিত হয়। কুলীন মেয়ের—'যেমন বরের শ্রী তেমনি শ্রীরও শ্রী, সকলি বিশ্রী কাণ্ড, কেবল শ্রী কি সুশ্রী হবে?"

চতুর্থ পর্বে—ফুলকুমারী ও যশোদার কথোপকথনে কুলীন-পত্নী ফুলকুমারীর মর্মন্তুদ হৃদয়-বেদনা চিত্রিত হয়েছে। বৃদ্ধা যশোদার উক্তিতে কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি নাট্যকারের ধিক্কার ধ্বনি—"হাঁরে বল্লাল তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের দিষ্টি কত্যে বলেছিল? কুল ত নয় এ কূলের আঁটি—বড কঠিন। যার কুল আছে তার কি দয়া নেই? ধম্ম নেই? কম্ম নেই?'

চতুর্থ অঙ্ক ঃ

প্রথম পর্বে—ভোলার স্বগতোক্তিতে তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—কৌতুকপ্রিয়তা, বাস্তবতাবোধ, চাকুরি সম্পর্কে তার মনোভাব—"চাকুরী না কুকুরি", বিশ্বস্ততা—'মুনিব যা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন? খ্যাম্তায়ে দেবে যে", বামুন

সম্পর্কে তার মনোভাব—প্রকাশিত। ধর্মশীলের সঙ্গে তার কথোপকথন। পৌরোহিত্যের আমন্ত্রণে ধর্মশীলের অর্থগৃধ্নুতা—'এবারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্মণীর নথ গড়ান হইতে পারিবে।'

দ্বিতীয় পর্বে—ধর্মশীল ও তর্কবাগীশের কথোপকথনে বল্লালী প্রথার অপকারিতার তাত্ত্বিক আলেচনা, কুলীন ব্রাহ্মণের চরিত্র পরিচয় ("তাঁহারা ধর্মাধর্মের প্রতি নেত্রপাত করে না, অর্থ পাইলে পরমার্থবোধে সকল দুষ্ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বয়োবিবেচনা, গুণ পর্যালোচনা, সৌন্দর্য্যাভিলাষ, জাতিবিনাশশঙ্কা, লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই; অর্থলোভে এক ব্যক্তি এক শত পর্য্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহ ব্যাপারে আলস্য নাই।")

বহুবিবাহকারী অধর্মরুচি সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে—"বে কর্ত্তে কি আলিস্যি হয়? গেলেম্—বে কল্লেম্—যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য পেলেম্—চল্যেম্ আর কি? বে অরুচির রুচি, যদি পাই রুপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি। তাতে কি আলিস্যি আছে?" কুলীনদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধর্মশীলের স্পষ্টোক্তিও লক্ষ্য করার মতো। এদের নিবাস—শ্বশুর বাড়ী, ব্যবসা—বিবাহ, শিক্ষাদীক্ষা লবডঙ্কা (আঃ আমি কি ডোম, সে ধর্মশাস্ত্র শিখে ধর্মপণ্ডিত হব?") কৌলীন্য প্রথার কারণে যে চারিত্রিক অধোগতি দেখা দিয়েছিল, তার বিবরণও অধর্মরুচির উক্তিতে প্রকাশ পায়। ধর্মশীলের কথায়, 'কুকার্যে যে লীন তাহাকেই কুলীন কহে'—তখনকার অবস্থায় অতি সত্য। অথচ বিবাহ শব্দের যথার্থ তাৎপর্য ভিন্নরূপ—'বিবাহ করিয়া পত্নীর ভরণপোষণ ও ধর্মরক্ষা করিতে হয়'। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণগণ বিবাহ দ্বারা নিজেদের অর্থলিপ্সাই শুধু চরিতার্থ করে। ফলে শিক্ষাদীক্ষাহীনা কুলীন পত্নীদের মধ্যে ব্যাভিচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে—"বর্ত্তমান কালে স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার সম্যক প্রথা নাই, সুতরাং তাহার অন্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত করিতে পায় না, চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ যৌবন যাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবেচনা বিহীনা হইয়া স্ব স্ব সমাহিত সাধনে যত্নবতী হয়, তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার তাহাদের ভ্রূভঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল হইয়া ওঠে।" ধর্মশীল এ ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট করে বলেন—"কিন্তু বল্লালি প্রথায় কুলীন কন্যা ও কুলীন কর্ত্তৃক বিবাহিত বণিতাদিগের প্রায় অহরহই বিরহ বেদনা সহ্য করিতে হয়, ও চিরদিনই পিত্রালয়ে থাকিতে হয়, সুতরাং তাহারা কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে? ব্যাভিচার দোষে অবশ্যই লিপ্ত হইয়া থাকে।" অর্থলোভী যাজক সম্প্রদায়ও স্বার্থের লোভে

এ কাজে পোষকতা করে থাকে—"আমরাও সেই সকল ব্যক্তির যাজন কার্য্যে ভুরি ভুরি মহাপাতক স্বীকার করিতেছি! কি করি? কালধর্ম সহকারে সকলি করিতে হয়।"

তৃতীয় পর্বে—বিবাহবণিক ও অধর্মরুচির কথোপকথন দৃশ্যে কৌলীন্যপ্রথার বিষময় ফল সম্পর্কে উপরের পর্বে যে বক্তব্য উক্ত হয়েছে, তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। অধর্মরুচির পিতা বিবাহবণিক। বিবাহ ব্যাপারে দুজনেই যথেষ্ট রুচিপরায়ণ। অধর্মরুচি সম্প্রতি একটি পত্র পেয়েছে—কোন এক জায়গায় তার কন্যার অন্নপ্রাশন। অথচ সে তিনবছর সে দেশে যায় নি। পিতা বিবাহ-বণিক তাকে সান্ত্বনা দেয়—"তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ও রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি?" অধর্মরুচি অধোমুখে প্রস্থান করে।

চতুর্থ—পর্বে কৌলিন্যপ্রথার বিষময় ফল—ব্যভিচারের আরো দৃষ্টান্ত উদাহৃত হয়েছে। বিবাহবণিকের অর্থের প্রয়োজন। কুলীনের পক্ষে অর্থ-নিষ্কাশনের উপযুক্ত স্থান—শ্বশুর বাড়ী। বিবাহবণিক ভাবছে—'কোথা যাই, বেলাও অনেকটা হয়েছে, নিকটে কি কোন শ্বশুর বাড়ী নাই?' কিছুক্ষণ চিন্তার পর তার মনে পড়ল—কাছেই বিমলাপুর গ্রামে একটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সে মনে করতে পারছেনা—'আমিই সেথায় বে করেছি, না পুত্রের বে দিছি?' সংশয় নিবারণের জন্য বিবাহবণিক ফর্দ খুলে দেখে—সে নিজেই সেখানে বিয়ে করেছিল। অতএব সেখানে যাওয়াই সে স্থির করল। কিন্তু তারা গরীব ব্রাহ্মণ—'কিছু দিতে পারবে এমন বোধ হয় না।' তবে ব্রাহ্মণীর কাটনা কাটা পয়সাও অন্ততঃ পাওয়া যেতে পারে—এই আশায় সে সেই গ্রামের দিকে চলতে লাগল। পথে উত্তম নামক একটি যুবকের নিকট পথের হদিশ জানতে গিয়ে তার সঙ্গে বিবাহবণিকের পরিচয় হল। জানা গেল—উত্তম বিবাহবণিকেরই পুত্র—বিমলপুরে যে স্ত্রীর কাছে যাচ্ছিল, উত্তম সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। উত্তম জন্মাবধি পিতৃদর্শনে বঞ্চিত, আজ পিতাকে দর্শন করে সে কৃতার্থ। এর উত্তরে বিবাহবণিকের স্বগতোক্তিতে কৌলীন্য প্রথার কারণে ব্যভিচারের চিত্রটি স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত হয়েছে—"তুমি দর্শন পাবে কি, তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই—সেই শুভদৃষ্টি মাত্রই যা হউক। কৈ, অধর্মরুচি বাপা এখন কোথায়,—কন্যা হয়েছে বলে বড় লজ্জা পেয়েছিলেন, দেখুন এসে, আমার এক কালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে!"

এই দৃশ্যে আরও একটা চিত্র পাওয়া যায়। লোক পরম্পরায় বিবাহবণিকের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর বিমলপুরী পত্নী বৈধব্য বেশ ধারণ করেছে। এখন জানা গেল —সে সংবাদ মিথ্যা। তাই উত্তম পিতাকে গৃহে নিয়ে যেতে চায়—প্রকৃত সংবাদ বিষয়ে মাতা ও মাতৃকুলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য—'তাঁহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতা ঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে।" বিবাহবণিকের স্বগতোক্তি বিশেষ কৌতুকাবহ—"স্বামী স্ত্রীর সকল দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পায় না। দেখ, আমি কি ভাগ্যবান। তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হা অদৃষ্ট!" বিবাহবণিক উত্তমের সঙ্গে যায়।

পঞ্চম পর্বে—নতুন দৃশ্যের সূচনা। এ দৃশ্যে কন্যা-বিক্রয় ব্যাপার নিয়ে সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। গর্ভবতী নামে এক রমণীর অপরাধ—সে বারে বারে পুত্র সন্তান প্রসব করছে। সেজন্য স্বামী ও শ্বশুর কুলের কাছে তার গঞ্জনার অবধি নেই। কারণ তাদের বংশে কন্যা বিক্রয় হয়—'আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর পাঁচটা মেয়ে বেচে কোটা করেছেন, আরও এখন দুটো আছে।" গর্ভবতার চারটিই পুত্র সন্তান। কিন্তু তার স্বামী তাকে শাসিয়েছে—'এবার যদি না মেয়ে হয়, দুব করে দিবো।' গর্ভবতী তাই ধর্মশীলের পা ধরে কেঁদে পড়েছে—'আপনি দয়া করে কিছু স্বস্ত্যেন করুন, যেন এবার মেয়ে হয়—আমি জ্বালা সৈতে পারিনে।" ধর্মশীল শিউরে উঠেন…'কন্যা বিক্রয়। যাহা শ্রবণেও পাপ স্পর্শে এ তাদৃশ্য ব্যাপারেও প্রাণিদিগের অভিরুচি।…যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে নরক হইতে তাহার নিস্তার নাই, সে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকে।" এই দৃশ্যে কন্যা বিক্রয়ের পাতকতা বিষয়ে শাস্ত্রীয় আলোচনাও বিশেষ তথ্যপ্রদ ও কৌতুহলোদ্দীপক। কন্যা বিক্রয় নামক অশাস্ত্রীয় ও অমানবিক ব্যাপার রদের জন্য দেশের শাসনকর্তৃপক্ষের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন—নাট্যকারের এই অভিমত এখানে ধর্মশীলের মাধ্যমে উক্ত হয়েছে। কন্যা বিক্রয় ও ক্রয়—শাস্ত্র বাক্য অনুসারে দুইই অন্যায়—প্রাচীন দত্তক মীমাংসা গ্রন্থে ধৃত প্রমাণও নাট্যকার এখানে উদ্ধৃত করেছেন। দৃশ্যের শেষে ধর্মশীল ও তর্কবাগীশ কুলপালকের গৃহে উপনীত হলেন।

পঞ্চম অঙ্ক :

প্রথম পর্ব। ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে। সুমতির ইচ্ছা—স্বামী উদরপরায়ণ যেন সেখানে ছেলেটাকেও নিয়ে যায়। তাহলে সেও ভালোমন্দ দুটো খেতে পাবে। উদরপরায়ণ অতি দরিদ্র, লোভী ব্রাহ্মণ। নেমন্তন্ন বা বিনা নেমন্তন্নে

ফলার খেয়ে বেড়ানোই তার পেশা—'তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া/ফলার সন্ধান করি খুঁজিয়া খুঁজিয়া।' তার ক্ষমতা নেই কানাকড়ি, কিন্তু মর্যাদাবোধ রয়েছে ষোল আনা। তাই স্ত্রীকে রাস্তায় দেখে সে ক্রুদ্ধ হয়—"কি! এমন যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর! লজ্জা নাই! ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না? এই চারিদিগে পুরুষ, এখানে আসা, দেকৃবি একবার?" কিন্তু গৃহিনী ফলারের খবর দিতে এসেছে শুনে তার সুর পালটে যায়—'আঁ. কি বল্যি? নিকটে আয়, নিকটে আয়, এখানে কেহই নাই, এত লজ্জাই বা কি?' উদরপরায়ণের উক্তিতে উত্তম, মধ্যম ও অধম ফলারের বিবরণ জানা গেল। লেখাপড়া শিখে ছেলেটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে—কারণ সে পিতার মত উদরপরায়ণ হতে পারছেনা। নিমন্ত্রণ ও অনিমন্ত্রণ ফলার সম্পর্কে উদরপরায়ণের অভিজ্ঞতা—"নিমন্ত্রণ অপেক্ষা অনিমন্ত্রণে অধিক মজা, নিমন্ত্রণে পেটে হয়, অনিমন্ত্রণে পেটে পিটে দুইয়েতেই হয়।" রোরুদ্যমান ছেলেকে ফেলে রেখেই উদরপরায়ণ বাড়ুজ্যে বাড়িতে ফলারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। পথে ন্যায়ালঙ্কারের সঙ্গে তার দেখা। ন্যায়ালঙ্কারের ভাষ্যে কুলীনের বিবাহের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত—"কুলপালক একটি বৃদ্ধ বর আনিয়াছে তাহাকে চারিটা মেয়ে দিবে, তাই বলি বৎসতরা চতুষ্টয় সহিত…"। কিন্তু উদরপরায়ণের পক্ষে—'ফলার ভাল হইলেই বে ভাল হয়।"

দ্বিতীয় পর্বে মাধবী ও জনৈকা মহিলার কথোপকথনে পতিবিধুরা দুই নারীর দ্বিমুখী চরিত্রবৈশিষ্ট্য উদঘাটিত। মাধবী ও মহিলা—দুজনেই কুলীন কন্যা ও কুলীন পত্নী। কিন্তু মাধবী সতী হয়েও পতি-সংস্পর্শবিহীনা। মহিলাটির জীবনও তাই। তার পতি-'সে আমার পতিত নয়, সে কেবল অধর্মেই পতিত।' ফলে মহিলাটি যৌবনজ্বালা নিবারণের জন্য পরপুরুষ সঙ্গ করে—'আমার ভাই তেমন রূপ নাই আমার কত শত কান্ত গড়াগড়ি ছড়াছড়ি যাচ্ছে।" মাধবীকেও সে প্রলোভন দেখায়। কিন্তু মাধবী সংস্কার ও লোকাপবাদের ভয়ে ইতস্ততঃ করে। শেষপর্যন্ত সে মহিলাটির অনুগমন করে—'তুই আমায় রক্ষা কর, তুই না করিলে কে করিবে। চল তোর সঙ্গে যাই, যা করিস্।' নাট্যকার এখানে কৌলীন্যপ্রথার কারণে সমাজে নৈতিক অধঃপতন কিভাবে সূচিত হচ্ছে, তার একটি সার্থক দৃষ্টান্ত নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক ঃ

কুলপালকের গৃহে বিবাহের উদ্যোগ হচ্ছে। বিবাহ ব্যাপারে চার বোনের মধ্যে চার ধরনের প্রতিক্রিয়া। জাহ্নবীর মনে আনন্দ নেই।—'আমি অস্তদন্তহীন হলাম,

এখন তীর্থে যাওয়াই আমার উচিত।' শান্তবার মনে এখনও কিছু অনুরাগ আছে—'ক্ষতি কি হলোই বা।' কামিনী যৌবনজ্বালায় পীড়িতা—'কুলে কালি দিয়ে কালী/বনে চলে যাব কালি/ঘটকালি কি করিবে আর।' থুত্থুড়ে বুড়ো বরের সঙ্গে বিবাহ যে বৈধব্যের নামান্তর, জাহ্নবী তা জানে—'এ বিয়ে হইলে মাত্র একাদশী ফল।'

দ্বিতীয় পর্বে—বিরহী পঞ্চানন ও বিবাহ বাতুল—এই দুটি বিপরীত প্রকৃতির চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অকুলীন ব্রাহ্মণের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে। একজন বিপত্নীক, কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়নি। অন্যজনের আদৌ বিবাহ হয়নি।

তৃতীয় পর্বে—কুলপালকের গৃহে বিবাহ-উৎসব। কুলপালক ধর্মশীলকে অনুরোধ করেন, বরকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে। ধর্মশীলের স্বগতোক্তিতে কুলীন বরের স্বরূপ উদ্ঘাটিত—'জাতিতে উপেক্ষা করি দীক্ষিত কুলেতে/ধর্মেতে অরুচি রুচি কেবল ধনেতে ॥/ দেখিতে কুৎসিত বুড়ো বিবাহে লালসা।/ এই বর রঙ্গস্থলে আসিল সহসা।" বর ও অনৃতাচার্যের প্রবেশ। বরদর্শনে ধর্মশীল মনে মনে আর্তনাদ করেন। দুই পুরোহিত—পণ্ডিত ধর্মশীল এবং মূর্খ অভব্যচন্দ্রের দ্বন্দ্ব। অভব্যচন্দ্র আচরণে, জ্ঞানে, বিদ্যায় যথার্থই চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। তবে তার মুখ দিয়ে নাট্যকার এরূপ বিবাহের যথার্থ মন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন—"ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। / এবং শ্মশানানলদ দগ্ধোহসি বান্ধবৈঃ।" আশীর্বাদ মন্ত্র—"সর্বনাশো মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈবচ। সর্বাঙ্গে ধবলাকারঃ অল্পায়ুর্ভূব সম্প্রতি।" ধর্মশীল যথার্থই বলেছেন—'ইনিই এ বিবাহের পৌরোহিত্য কর্মে উপযুক্ত"। বলাবাহুল্য নাট্যকার রামনারায়ণ এরূপ বিবাহের অন্তঃসার-শূন্যতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এই মন্ত্রের দ্বারা।

তৃতীয় পর্বে বরের রূপগুণের (?) বিস্তৃত বর্ণনা হাস্যরসের মধ্য দিয়েও এর অন্তরালের কারুণ্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। বিবাহ নিষ্পন্ন হ'ল। তারপর নটের উক্তি—'বর দেখি বামাগণ করে গণ্ডগোল। / বিবাহ নির্বাহ হলো হরি হরি বোল ॥' বিবাহ উৎসবে এই 'হরিবোল', ধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সমাজমনস্ক' মানবদরদী নাট্যকার রামনারায়ণ কৌলিন্য প্রথার প্রতি তাঁর ধিক্কার এবং এরূপ বিবাহের পরিণতির ইঙ্গিত দান করেছেন।

কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা ও বহুবিবাহের বিষময় ফল প্রদর্শনের নিমিত্ত রচিত এই উদ্দেশ্যমূলক নাটকে নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন শুধু কুলীন কন্যার

বিবাহসমস্যাই নয়, বস্তুতঃ তার আনুষঙ্গিক বিষফলও তুলে ধরেছেন। কুলপালক নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁর চার কন্যা। কন্যাদের বিবাহ তিনি কুলীনের সঙ্গে দিতে চান। তিনি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন। সুতরাং কন্যাদিগকেও উপযুক্ত বংশ মর্যাদা সম্পন্ন কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান। কারণ কুলপালক কোনক্রমেই বংশমর্যাদা ক্ষুন্ন করতে রাজী নন।— 'সমযোগ্য পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি ? কি এখন যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়া চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব ?" সুতরাং যথাযোগ্য কুলীন পাত্রের সন্ধান করতে করতে তার কন্যাদের বয়স যথেষ্ট হয়েছে। আলোচ্য নাট্যকাহিনীতে কুলপালকের কন্যাদের বিবাহ ব্যাপার স্থিরীকৃত ও সংঘটিত হয়েছে।

এছাড়া কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল তদানীন্তন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে—'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে"—তার রূপায়ণই নাট্যকারের লক্ষ্য। রামনারায়ণের নিজের ভাষায়—"পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতিমর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম।" এই নাটকটি সেই অভিলাষের ফল।

এই নাটকের বিষয়বস্তু কৌলীন্য প্রথার সার্বিক অপকারিতা। সুতরাং কুলপালকের বিবাহ ব্যাপারই এর একমাত্র বর্ণিতব্য বিষয় নহে। ফলে নাট্যকার আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত একটি কাহিনীকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিবর্তন ও পরিবর্তনের পথে পরিণতিতে টেনে নিয়ে যান নি। কাহিনীর বহুচারিতা সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই সচেতন ছিলেন। তাই ভূমিকায় তিনি কাহিনীধারা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন—"এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।"

এই নাটকের কাহিনীধারা তাই বহুধাবিভক্ত। নাট্যকারের একটাই

উদ্দেশ্য—কৌলীন্যপ্রথার দোষোদ্ঘোষণ। কৌলীন্যপ্রথার বহুধাবিচিত্র বিকৃতির ফুলকে তিনি একটি উদ্দেশ্যের সূত্রে গ্রথিত করে একটি বর্ণাঢ্য মালিকা রচনা করেছেন। কুলপালকের চার কন্যার বিবাহসমস্যা, প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞ ঘটকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, অকুলীন পাত্রের বিবাহ সমস্যা, পতি-সংসর্গবঞ্চিতা কুলীন পত্নীর যৌবন যাতনার ফলে ব্যভিচারগামিতা ও অবৈধ সন্তান লাভ, অর্থের লোভে কুলীনের সেই সন্তানের পিতৃত্ব-স্বীকার, কন্যা বিক্রয়, স্ত্রী আচার, স্বৈরিণী নারীর জীবনচিত্র, আচারধর্মের নামে অমানবিকতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ রামনারায়ণ এই নাট্য-পটভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন। আর কাহিনী-বিন্যাসের মুন্সীয়ানা অপেক্ষা সামগ্রিক সমাজজীবনকে নাট্যরূপে উপস্থাপিত করাতেই নাটুকে রামনারায়ণের দক্ষতা ও সাফল্য সূচিত।

চরিত্র চিত্রণ

রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন কুলসর্বস্ব" উদ্দেশ্যমূলক নাটক। তদানীন্তন সমাজের পচনশীল অবস্থার নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধি লক্ষ্যণীয়। নিছক। শিল্পমানসের তাগিদে নয়, সমাজেব দুষ্ট ক্ষতের স্বরূপ উন্মোচনেই 'নাটুকে' রামনারায়ণের মনোনিবেশ ঘটেছে এ নাটকে। ভূমিকায় তিনি তাঁর এ মনোভাবের কথা গোপন রাখেন নি। কৌলিন্য প্রথার অপকারিতা, কুলীন সমাজের নানাদিকের অবস্থা, ঘটক ও পুরোহিতসমাজের চিত্র, রসিকা নাগরিকার মনোভঙ্গি, কন্যাবিক্রয়ীর চিত্র, ও ক্রয়ীর অবস্থা—সামাজিক অধোগতির নানা চিত্রই নাট্যকার এ নাটকে তুলে ধরেছেন। এ নাটকে তাই বহু চরিত্রের মিছিল। চরিত্রগুলিও অনেক ক্ষেত্রে 'টাইপ' ধর্মী। আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত কোন কাহিনীধারা বিবর্তন ও পরিবর্তনের পথে পরিণতির পথে পৌঁছোতে পেরেছে, এমনও নয়। রামনারায়ণ এখানে বহু রঙের চিত্র-রচনাতেই বেশি তৎপর। তবু দেখা যায় যে, ছোট ছোট পরিধির মধ্যে বর্ণিত চরিত্রগুলিও বিশেষ বিশেষ বক্তব্যের বাহন হয়েও দু' একটি সংলাপ বা আচরণের মাধ্যমেই স্বাতন্ত্র্যে অভিষিক্ত হয়েছে। এখানেই রামনারায়ণের সৃজন-শক্তির সার্থকতা। শ্রদ্ধেয় সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'কুলীন-কুল-সর্বস্ব" নাটক সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহার মধ্যে বাস্তব চরিত্র-সৃষ্টির প্রয়াস কোন কোন স্থানে সাফল্যলাভ করিয়াছে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে বাস্তব চরিত্র রূপায়ণের প্রথম প্রয়াস ইহার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।"[১]

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৫৯।

কুলপালক :

নৈকষ্যকুলীন কুলপালক বন্দোপাধ্যায় চারটি কন্যা সন্তানের পিতা। বংশমর্যাদাকে তিনি অধিক মর্যাদা দেন। তাই কন্যা চতুষ্টয়ের বিবাহদানের নিমিত্ত উপযুক্ত কুলীন পাত্রের অনুসন্ধান করেন। অকুলীন পাত্রে কন্যা-সম্প্রদান করে কুলপালক বংশমর্যাদা ক্ষুন্ন করে ভঙ্গজে পরিণত হতে চান না। তাঁর বক্তব্য "সমযোগ্য পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি ?' আবার এই দেশাচার যে যথেষ্ট ক্লেশদায়ক, এটাও তিনি অনুভব করেন—"আঃ পোড়া দেশীয় দিগের কি দুরন্ত প্রথা। অতিমন্দ, অতিমন্দ, এমন দেখি নাই।" তবুও কুলপ্রথা অনুযায়ী কুলীনপাত্রে কন্যা সমর্পণের জন্য তিনি দেশে-দেশে ঘটক প্রেরণ করেন—কারণ কন্যা পাত্রস্থ করতে না পেরে কুলপালক "রাহুগ্রস্তদিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায়" হয়ে পড়েন। অনৃতাচার্যের মাধ্যমে পাত্রের সন্ধান পেয়ে তিনি জানান—"আমি আপনাকে একশত মুদ্রা পুরস্কার দিব, আর বৈবাহিক ব্যাপারে কৃপণতা করিব না।" আবার এ প্রশ্নও তাঁর মনে জাগে—"পাত্র কেমন, কৌলীন্য মানা কি প্রকার, বলুন ?" বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য—একথা শুনেও তিনি সেখানে বিবাহ দানের সিদ্ধান্ত নিয়ে দিন স্থির করতে অনুরোধ জানান। আগামীকাল বিবাহের দিন স্থির হয়েছে শুনে কুলপালকেব চিন্তা হয়—"এক্ষণে দ্রব্যাসাদন ব্যতিরেকে কি প্রকারে এত শীঘ্র কর্ম সম্পন্ন হইবে, তাহার উপায় কি ?" এখানে কুলপালকের সামাজিক মর্যাদার চিন্তাই প্রধান হয়ে ওঠে। কুলপালক রসিকতাবোধ থেকেও বঞ্চিত নন। অনৃতাচার্য যখন তাঁকে বলেন যে, আয়োজনের কোন বাহুল্যের প্রয়োজন নেই, কারণ-'বরযাত্র আমি, কন্যাযাত্র তুমি, আর পৌরোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্তব্যকর্ম, তা আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে", তার উত্তরে কুলপালক পরিহাসের সুরে তাকে বলেন—"তবে নাপিতের কর্মও কি আপনি করিবেন !" এতে অনৃতাচার্য কিঞ্চিৎ কড়স্বরে তাঁকে জানান যে, বিলম্ব করিলে বর হাতছাড়া হয়ে হতে পারে। এ কথায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ভীত হয়ে বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কুলপালকের স্ত্রী স্বামীর এইরূপ কুল নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করেনা—'সে 'কুল' খোঁজে, বলে 'কুল' থাকলেই সব থাকে।' বস্তুতঃ এটাই কুলপালকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ধর্মশীলের স্বগত বিদ্রূপোক্তিতেও কুলপালকের এই মনোভাবের প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে "এই বর ! কুলপালক ইহাকে কন্যা দিবে ! তাহাতেই কুলরক্ষা হইবে ?" দুই পুরোহিতের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে কুলপালক কন্যা সম্প্রদানে বিঘ্ন উপস্থিত দেখে আশঙ্কায় দুজনকেই পৌরোহিত্যে বরণ করেন। শিষ্টাচারের

বিধিও তিনি বিস্মৃত হননি, যদিও কৌলীন্যের অহমিকা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান—"মহাশয়! যদিও আমাদিগের জাতিতে বিবাহ বিষয়ে কৌলীন্যই অপেক্ষণীয় বটে, তথাপি শিষ্টাচার দৃষ্টান্তে আপনি বরের পরিচয় লোন।" বলাবাহুল্য, বরের পরিচয় জ্ঞাপনে কৌলীন্যপ্রথার ট্রাজিক পরিণতি অশ্রু ভরা হাসির আবরণে উচ্চকিত হয়ে ওঠে, সন্দেহ নেই। কুলপালক সার্থকনামা চরিত্র। মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এই চরিত্রে একান্তভাবেই অনুপস্থিত।

অনৃতাচার্য ঃ

অনৃতাচার্য ঘটক। প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর অথচ বাক্‌পটু এই চরিত্রটি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুলপালকের উক্তিতে প্রথম তার উল্লেখ পাওয়া যায়—"অনৃতাচায ও শুভাচার্য নামক দুই ঘটককে ঐ উদ্দেশ্যে দেশে দেশে প্রেরণ করিয়াছি।" দ্বিতীয় অঙ্কেব প্রথমেই আমরা তার দেখা পাই। সুধীর তার সম্পর্কে যে বিশেষণ প্রয়োগ করেছে, তা যথাযথই অনৃতাচার্য্যের চরিত্রদ্যোতক। বর্ণনাটি এরূপ—"আসিল পরের জাতি কুলনাশ হেতু। / বিবাহ নির্বাহ বিধি জলধির সেতু॥ / অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধর্ম কর্ম্ম। / চূড়ামণি মিথ্যাবাদী অনৃতাচার্য্য শর্ম্মা।" অনৃতাচার্য্য শর্ম্মা যথার্থই মিথ্যাবাদীর শিরোমণি। অন্যপক্ষে নিজের স্বার্থও সে ষোল আনা বোঝে। ঘটক শুভাচার্য্যের সঙ্গে তার পরিচয় হওয়া মাত্র সে প্রমাদ গুনে, পাছে তার বাড়া ভাতে ছাই পড়ে। তাই সে মনে মনে স্থির করে—'একে না তাড়ালে হবে না।' অনৃতাচার্য্যের পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই নেই, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানের অহমিকা যথেষ্টই রয়েছে।

মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি দিয়ে সে প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে চায়। তাই শুভাচার্যের কল্পিত বংশলতিকা আউড়ে সে তাকে তাক লাগিয়ে দিতে চায় এবং গর্ব সহকারে বলে—"আমি কি জানিনা।...আমার অবিদিত কোন ঘর আছে?" কিন্তু নিজের পিতৃ-পিতামহের নাম সে ভুলে যায়। এই ভণ্ড ঘটক চূড়ামণি সম্পর্কে শুভাচার্য যথার্থই বলেছে "ইনি এমনি ঘটকই বটে, নিজের পিতৃনাম বিস্মৃত হন। কিন্তু অন্যের পিতৃপিতামহের নাম ইহার মুখাগ্রবর্তী সে সময়ে একটাও ঠেকেনা।" ঘটক সম্পর্কে অনৃতাচার্য যে লক্ষণ নিরূপণ করে, তা তার নিজের সম্পর্কেই সমুচিত প্রযোজ্য—

প্রবঞ্চনা পরায়ণ মুখে প্রিয় আলাপন
ধর্মাধর্মে নাই বিচারণ।
না পাইলে বলে কটু স্বোদর পুরণে পটু
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ॥

বাচাল আচার ভ্রষ্ট জাতিকুল করে নষ্ট
দুষ্টমতি মূর্খের প্রবব।
বিবাদে নাবদ সম মূর্তিমান যেন তম
হয নয বস সুধীবর॥

অনৃতাচার্যের স্বকপোলকল্পিত "বেল্লিক পুরাণে মাতলামি খণ্ডে' থেকে উদ্ধৃত এই অংশ ও গ্রন্থনাম উল্লেখ তাকে বুঝবাব পক্ষে যথেষ্ট সহাযক। নিজেব গুণের সম্পর্কে সে যে সব কথা বলেছে, তাতে তাব নির্লজ্জতা, লোলুপতা ও অপমানবোধ-হীনতা প্রকাশ পায—"আমি সার্বর্ণ গৃহে কতশত কৈবর্ত্ত কন্যা চালাযেছি। শুদ্ধ শ্রোত্রিয বরে ক্ষত্রিয কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুবের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবর্ত্তীব সন্তানে পদ্মবাজ দুহিতা ঘটাযেছি, আব কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এ সমস্ত ত আমাব শবীবেব আভবণ। এই ১৪ই মাঘে খাড়াবাটীর কচিবাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বব বব প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তেব কিঞ্চিৎ দাক্ষণা পাইযা মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমাব একপ অপকপ চাতুর্য্য যে, এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন কোথায অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখাও।' অনৃতাচায নীচ, দুষ্ট প্রকৃতিব লোক সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজেব দুষ্কার্য্যের যেমন, তেমনি হেনস্তাব কথাও এমনভাবে সে বিবৃত করে, যাতে তাকে শিল্পাজনোচিত নিরাসক্ত মনেব মানুষ বলে স্বীকার না কবে পাবা যায না। অনৃতাচায বাস্তব-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ। আবেগপ্রবণতাব লেশমাত্র তাকে স্পর্শ করে না। তাই আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যায, অনৈতিক কর্ম করতেও সে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ কবে না। একবার ছাড়া আর কখনো সে সেজন্য বিবেকদংশনও অনুভব করেনি। কুলপালকের কন্যাদের বিবাহের দিন স্থির করার জন্য গ্রহাচার্যের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর এই বিবেকযন্ত্রণা লহমার জন্য অনুভব করা যায়। আগামী কল্য বিবাহের দিন না হলেও অনৃতাচায সেদিনই বিবাহ অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক। "কিন্তু কল্য সপ্তশলাক, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে"—এই প্রশ্নোত্তরে তার স্বগতোক্তি—"শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরাত সর্বদাই বৈধব্য বেদনা সহ্য করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি? অতএব ইহাকে বাক্‌ছলে প্রতারিত করিয়া স্বকার্য সাধনে চেষ্টা করি।" উক্তির প্রথমাংশে তার ভেতরকার মানুষটা একবার উঁকি দিয়েই মিলিযে যায়, পরমুহূর্তেই তার ভিতরকার বাক্‌পটু, স্বার্থপর, প্রবঞ্চক মানুষটি আপন প্রভাব বিস্তার ও স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হয়ে ওঠে। মিথ্যাভাষণে পটু অনৃতাচার্য গ্রহাচার্যকে বাক্‌ছলে

প্রতারিত করতে না পেরে স্বমূর্তি ধারণ করে তাকে বিদায় দানই কাম্য মনে করে—"তুই দূর হ, আর দিন দেখিতে হইবে না'। সে আগামীকল্য বিবাহের দিন নিজেই স্থির করে, এবং তার জন্য যে যুক্তি খাঁড়া করে, তাও অদ্ভুত। কুলপালকের চার কন্যার বিবাহ ব্যাপারে সে আদৌ বিলম্ব করতে চায় না, কারণ তাতে বরের গুণপণা (?) প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং ঘটক বিদায় থেকে সে বঞ্চিত হবে। সুতরাং সে বিবাহ বিলম্বে নানা বিঘ্নের ভয় দেখায়, এবং বিবাহে লোকজন আনাও বিঘ্নের কারণ মনে করে। সুতরাং—'বরযাত্র আমি, কন্যাযাত্র তুমি, আর পৌরোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম, তাহা আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে।" বলে কুলপালককে আশ্বস্ত করে। এরপর বিবাহসভায় অনৃতাচার্যের করিৎকর্মা-চরিত্র আরো স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। বরের বধিরতাগুণ চাপা দেওয়ার জন্য এই বাক্চতুর ঘটক জানায়, 'বিবাহ রাত্রে বর আর চোর—তুল্য, আজি বর কি কোথাও কথা কয়?" বরের লেখাপড়া 'বিস্মৃতিক্রমে হয় নাই বটে।' বিধাতা ববের কপালে লেখাপড়ার কথা লিখতে ভুলেছেন, তাই হয় নি, তাতে বরের দোষ কি?—তার যুক্তি। আর একটি স্পষ্ট কথাও তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে—'যেথায় পডামেয়ের বে, সেথায় বরের পডার কথায় প্রয়োজন কি?' এরপর বরের রূপগুণ বিচারে তার উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়। তবুও ধর্মশীলের কথায় বিবাহ পণ্ড হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনৃতাচার্য লোভের অস্ত্র প্রয়োগ করে তাকে বশীভূত করে—'দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দেও বিয়া।' বস্তুতঃ, অনৃতাচার্য চরিত্রটি এই নাটকে সক্রিয়, উজ্জ্বল ও জীবন্তরূপে প্রতিভাত হয়েছে, সন্দেহ নেই।

ধর্মশীল :

মানবিক বৃত্তিসম্পন্ন পুরোহিত চরিত্র ধর্মশীল নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশের বাহন স্বরূপ। প্রাপ্তির লোভ তার মধ্যেও আছে। তাই ভোলার আহ্বানে সে প্রথমে বিরক্ত হয়, কিন্তু বিবাহের পৌরোহিত্য কর্মের কথায় তার স্বর পালটে যায় এবং তৎক্ষণাৎ মনে মনে হিসাব করতে বসে—"এবারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্মণীর নথ গডান হইতে পারিবে।" বল্লালকৃত কুলগৌরবলোভে তদানীন্তন সমাজ "বিশুদ্ধ শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করিয়া কতশত পাতক না স্বীকার করিয়াছে"—এ ব্যাপারে ধর্মশীল সচেতন। কিন্তু—"করুক, যাহার যাহা অভিমত,—দক্ষিণা প্রাপ্তি হইলেই আমার অভিমত সিদ্ধ হয়, দিনের কথায় কাজ কি?"

ধর্মশীল চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বল্লালী প্রথার কুফল, বাল্যবিবাহের

ব্যাপারে শাস্ত্রীয় যুক্তি, কুলীন—বিবাহিতা ও অবিবাহিতা—রমণীর মধ্যে ব্যাভিচারের প্রাদুর্ভাবের কারণ, কন্যাবিক্রয়ের পাপ, পুত্রসন্তান লাভের উপযোগিতা ইত্যাদি নানা তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন। এই চরিত্রটি মানবিকগুণ থেকেও বঞ্চিত নয়। গর্ভবতী তার স্বামীর দ্বারা প্রহৃতা হয় শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হন—'স্ত্রীলোকের নিগ্রহ, এ কি!" জীবনধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন,, তাই বিবেক দংশন অনুভব করেও ধর্মশীল অনেক পাপাচরণে অংশ ভাগী হন। কুলপালকের কন্যাদের সঙ্গে কুলীন নামধারী অজ্ঞ, মূর্খ, দাঁদওয়ালা, গোঁদা, বসন্তে মুখ বিকৃত, কানা পাত্রের বিবাহে-ও ধর্মশীল দক্ষিণার লোভে পৌরোহিত্য কর্মে স্বীকৃত হন, কারণ "সকলেই স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে পর্যটন করে।' কিন্তু তিনি সচেতন যে—"বিধাতা পুবীষের পু, রোষের 'রো', হিংসার 'হি' আর তস্করের 'ত'—এই চারি অক্ষর একত্রিত করিয়া 'পুরোহিত' করিয়াছেন, অতএব আমার এত নিষ্ঠার প্রয়োজন কি? অন্যের কন্যা অন্যে বিবাহ করিবে, তাহার ভালমন্দ আমার বিবেচনার বা কার্য্য কি? আমি ত দ্বিগুণ দক্ষিণা পাইব, তাহলেই হলো।" বস্তুতঃ কাঞ্চন কৌলীন্য শাসিত সমাজ একজন বিবেকবান. শাস্ত্রজ্ঞ, হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে কিভাবে কুপথে টেনে নামায, ধর্মশীল চরিত্রটি তার সার্থক উদাহরণ।

শুভাচার্য:

শুভাচার্য একজন ঘটক ব্রাহ্মণ। অনৃতাচার্যের ঠিক বিপরীত প্রকৃতির চরিত্র। ঘটক হিসাবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে যথাযোগ্যা কন্যার মিলনের সে পক্ষপাতী। শাস্ত্রের উপর অধিকার তার আছে। বল্লালী প্রথার উৎপত্তির ইতিহাস তার মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই। অনৃতাচার্যর মিথ্যা প্রলাপোক্তির অসারতা শুভাচার্য প্রথম থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছে। অনৃতাচার্য তার কাল্পনিক বংশলতিকা বললে শুভাচার্য স্পষ্টতঃই বিরক্ত হয় এবং অনৃতাচার্যের বংশ পরিচয় জানতে চায়। উদ্দেশ্য তার স্বরূপ উদঘাটন করা—'ইনি এমনি ঘটকই বটে, নিজ পিতৃনামও বিস্মৃত হন। কিন্তু অন্যের পিতৃপিতামহের নাম ইহার মুখাগ্রবর্তী সে সময়ে একটাও ঠেকে না।' শুভাচার্য চতুর ঘটক নয়—শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে সৎ পথে থেকে সে ঘটকবৃত্তিকে পেশা হিসাবে নিয়েছে।—অনৃতাচার্যের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তার এই শাস্ত্রজ্ঞান ও পরিশীলিত পরিচয় পাওয়া যায়। শঠ, চতুর, প্রতারক, ভণ্ড, মিথ্যা ও কটুভাষী অনৃতাচার্যের, একারণেই সে, বিপরীতমুখী চরিত্র। এরূপ অধম প্রকৃতির মানুষের নীচ প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে পেরে উঠবে না, এটা বুঝে নিয়ে

শুভাচার্য ঘটকালির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সরে পড়েছে। কারণ সে সারকথা বুঝেছে যে,—'এই হস্তিমূর্খ, ইহার কিছুই অকার্য্য নাই, ইহার মতের অন্যথা কাহলে উত্তম মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।'

গ্রহাচার্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ইনি ক্রিয়াকর্মের বিধান দেন। অনৃতাচার্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিবাহ সমাধা করে ফেলতে চায়। সেইজন্যই দিনধার্যের জন্য সে গ্রহাচার্যের কাছে এসেছে। অনৃতাচার্যের বাক্‌জালে আবদ্ধ হয়ে গ্রহাচার্য কিছুতেই অশুভ 'আগামীকল্য'-কে শুভ বলতে চায় না। সপ্তশলাক-দিনে বিবাহ হলে কন্যা বিধবা হয়, এটা জেনেও অনৃতাচার্য দিনটাকে শুভ বলে ধার্য করবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। শুভাচার্যকে স্বমতে আনতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বলে—'তুই দূর হ।' বস্তুত কুলীনকন্যার বিবাহের ট্রাজেডিকে প্রকটিত করবার জন্য নাট্যকার শুভাচার্য চরিত্রের প্রবর্তন ও এই দৃশ্যের উপস্থাপন করেছেন সন্দেহ নেই।

ধর্মশীল পুরোহিত ব্রাহ্মণ। কুলপালকের কন্যাদের বিবাহে পৌরোহিত্য করবার জন্য তার আমন্ত্রণ এসেছে। চার কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করতে হবে শুনে সে খুব খুশী, কারণ—'এবারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্মণীর নথ গড়ান হইতে পারিবে।' তর্কবাগীশকে সঙ্গে নিয়ে সে কুলপালকের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ধর্মশীলের চেতনায় ন্যায়-অন্যায় বোধ রয়েছে—তবে সে অনধিকার চর্চা করেনা। অশুভদিনে কুলপালক কন্যাদের বিবাহ দিচ্ছে জেনেও তার অভিমত—'করুক, যাহার যাহা অভিমত,—দক্ষিণা প্রাপ্ত হলেই আমার অভিমত সিদ্ধ হয়, দিনের কথায় কায কি?' ধর্মশীল সব বোঝে। কিন্তু সবকিছুকে সে বাস্তবভাবে গ্রহণ করে। তার কথায় অনূঢ়া কন্যার বিবাহ ব্যাপারে শাস্ত্রোক্তি, বল্লালী প্রথার অপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। কুলীনদের সম্পর্কে তার উক্তি—'তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না, অর্থ পাইলে পরমার্থবোধে সকল দুষ্ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বয়োবিবেচনা, সৌন্দর্য্যাভিলাষ, জাতিবিনাশ শঙ্কা, লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই, অর্থলোভে এক ব্যক্তি একশত পর্য্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহ ব্যাপারে আলস্য নাই।' অধর্মরুচির সঙ্গে তার কথোপকথনে কুলীনের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও কীর্তিকলাপ উদ্‌ঘাটিত হয়। ধর্মশীলের উক্তি—'কুকার্যে যে লীন তাহাকেই কুলীন কহে'—তার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করে। নাট্যকার এ-বিষয়ে তাঁর মনোভাব ধর্মশীল চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কুলীনকন্যাদের

মধ্যে নানারূপ ব্যভিচার দেখা দেওয়ার কারণও তার মুখে উক্ত হয়েছে—'বর্ত্তমানকালে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার সম্যক্ প্রথা নাই, সুতরাং তাহার অন্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত করিতে পায় না, চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ যৌবনযাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবেচনা বিহীনা হইয়া স্বস্ব সমীহিত সাধনে যত্নবতী হয়, তাহাতে জাতিপাত বা জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার তাহাদের ভ্রূভঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল হইয়া ওঠে।' কুলীনকন্যাদের ব্যভিচার-দোষের কারণ কিন্তু তারা নিজেরা নয়—এটাও ধর্মশীল লক্ষ্য করেছে; কিন্তু সে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সবকিছু দেখে যায় শুধু। সেই মহাপাতকের অংশভাগী যে তারাও হচ্ছে, এ-বিষয়ে সে সচেতন। কিন্তু বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে সে বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করতে দ্বিধা করে না—'আমরাও সেই সকল ব্যক্তির যজন কার্য্যে ভূরি ভূরি মহাপাতক স্বীকার করিতেছি! কি করি? কালধর্ম সহকারে সকলি করিতে হয়।' অভাবে পড়ে, কিংবা অবস্থার বিপাকে পড়ে ধর্মশীল এতাদৃশ বিবাহের যজনকার্যে প্রবৃত্ত হলেও তার সংবেদনশীল অন্তঃকরণ কুলীনকন্যার দুর্ভাগ্যে অশ্রুমোচন করে। কুলপালকের জামাতা বরণ করতে গিয়ে তার স্বগতোক্তি—'এই বর! কুলপালক ইহাকে কন্যা দিবে! তাহাতেই কুলরক্ষা হইবে! হে বল্লাল! লোকে তোমাকে যে কলির চেলা কহে তাহা যথার্থ। হে ভগবন্ জগদীশ্বর! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইল!!!'

তার এই উক্তিতে সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়ের উষ্ণ, বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস অনুভব করা যায়। তবু এমন কদর্য, বিকৃত-দেহ বরের সঙ্গে কুলপালকের কন্যাদের বিবাহে তার মনের আপত্তি বুঝতে পেরে অনৃতাচার্য তাকে প্রলোভন দেখায়—'দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দেও বিয়া।' দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রলোভন সাপের মাথায় ধুলো পড়ার মত। আর ধর্মশীল তো জানে যে, 'সকলেই স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে পর্যটন করে।' ধর্মশীলের মতে পুরোহিত এক নিকৃষ্ট জীব, অন্যায়ের স্রোতে সেও গা ভাসায় দক্ষিণার লোভে—

'বিধাতা পুরীষের 'পু', রোষের 'রো', হিংসার 'হি', আর তস্করের 'ত', এই চারি অক্ষর একত্র করিয়া 'পুরোহিত' করিয়াছেন, অতএব আমার এত নিষ্ঠার প্রয়োজন কি? অন্যের কন্যা অন্যে বিবাহ করিবে, তাহার ভালমন্দ আমার বিবেচনায় বা কার্য্য কি? আমি ত দ্বিগুণ দক্ষিণা পাইব, তা হলেই হলো।'

কিন্তু সেই সঙ্গে তার ধর্মশীল মনের বিবেক যন্ত্রণাটুকুও আমরা স্পষ্টই অনুভব করতে পারি।

দেবল পূজক ব্রাহ্মণ। রসিকা নাপিতানীর সঙ্গে কথোপকথনের একটিমাত্র দৃশ্যে তার উপস্থিতি। হাস্যপরিহাসপ্রিয় এই চরিত্রটির উপস্থিতি মূলত রসিকার চরিত্র স্ফুটনের জন্য।

অভব্যচন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ ব্যক্তি। জনরবে আকৃষ্ট হয়ে সে কুলপালকের গৃহে পৌরোহিত্য করবার বাসনা নিয়ে এসেছে। অথচ তার কথাবার্তা শুনে বোঝা যায়, যাজনিক ক্রিয়াকর্ম, মন্ত্রতন্ত্র সে কিছুই জানে না। তাছাডা পৌরোহিত্য করার জন্য কুলপালকের দ্বারা সে আহুত-ও নয়। কুলপালকের সঙ্গে তার পরিচয়ও নেই।

ভোলা কুলপালকের কৃষাণ ভৃত্য, জাতিতেও সে উচ্চবংশীয় নয়। কিন্তু এই চরিত্রটি নাট্যকারের সহানুভূতিস্পর্শে রক্ত-মাংসের সজীবতা পেয়েছে। সে জাতিতে নীচ, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। তাছাডা অসামান্য কৌতুক-বোধ এই চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সে প্রখর বাস্তবজ্ঞানেরও অধিকারী। চতুর্থ অঙ্কের সূচনায় ভোলার সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই সে তার কর্মজীবনের প্রকৃত ও বিড়ম্বিত অবস্থাটি সকৌতুকে তুলে ধরেছে নিম্নভাষায় —'মোগাব কপালে দুক নেকেচে গোঁসাই। / খাট্টি ২ মরি এট্টু বষ্টি পাই নাই॥ / বসি ঘরে প্যাটভরে খাতি নাই পাই। / চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই॥' নিতান্ত পেটের দায়েই এই মানুষটি দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করেছে।— উদয়াস্ত তাকে পরিশ্রম করতে হয়, বিশ্রামের অবকাশও সে পায় না। অথচ নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তাকে মুখ বুঁজে মনিবের হুকুম তামিল করতে হয়। তা না হলে খাওয়া জুটবে কি করে—'তা খাতিপাত্তি পাইনে না কবে কি কর্বো? মুনিব যা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন? খ্যাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্ছি, আসি তবে তামুক খাব।' এই প্রসঙ্গে ভোলার পত্নীগতপ্রাণটিও উঁকি মারে— 'তাইতো মোদের বৌ বলে হালো, বলে 'চাকুরি না কুকুরি'...।' দাসবৃত্তির নিদারুণ বেদনা ভোলা নিজে অন্তর দিয়ে বোঝে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্ত্রীর মতামতের উপর তার অবিচল আস্থাটুকুও এখানে গোপন থাকেনি। তাছাড়া তার উপস্থিত ও বাস্তববুদ্ধিও রয়েছে দেখা যায়। কর্তা তাকে বলেছেন পুরোহিতকে ডেকে 'এদবের বেলা এট্টা খোড়ের গাচ্ আনিস্'। কিন্তু সে দা আনতে ভুলে গেছে। তাই সে বুদ্ধি করল যে, ওই ঝি বিনির বাড়ি থেকে দা

চেয়ে নেবে। পুরুত বামুন সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই—তাই অক্লেশে সে মনে মনে বলতে পারে—'শালার বামুন কদ্দুর ঘর বেনিয়েছে।' কিন্তু কার্যোদ্ধারের জন্য সে পুরুতঠাকুর না বলে বাবাঠাকুর বলে ডাকতে দ্বিধা করে না। বামুন ও বডমানুষ সম্পর্কে ভোলার মোহমুক্ত ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তার তীক্ষ্ণতার ও বিতৃষ্ণার পরিচায়ক—'কৈ ওত্তর দেয় না যে? কোথা বুঝি ছরাদ কত্তি গেছে। বামুন্দের কি? বড মান্‌ষির বাড়িই ছায়ায় বসি গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড্ডুক তামুক খায়, গপ্পি করে, তাই বুঝি গেচে।' পুরোহিত ধর্মশীলের সঙ্গে সাক্ষাতে সে আবার বিনয় প্রকাশ করতে ভোলে না। বস্তুত সংলাপের চাতুর্যে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, কৌতুকরসের ভিয়েনে ভোলার চরিত্রটি যথার্থই উপভোগ্য হয়েছে।

বিবাহবণিক ও অধর্মরুচি—চরিত্র দুটি পিতাপুত্রের। এই দু'টি কুলীনকুলের রত্নস্বরূপ। ধর্মশীল কুলীনদের সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলেছে—'তাঁহারা ধর্মাধর্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না, অর্থ পাইলে পরমার্থবোধে সকল দুষ্ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। তাহাদিগের বয়ো-বিবেচনা, গুণ-পর্য্যালোচনা, সৌন্দর্য্যাভিলাষ, জাতি-বিনাশ শঙ্কা, লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই,—অর্থলোভে এক ব্যক্তি একশত পর্য্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহ ব্যাপারে আলস্য নাই!' বস্তুত সেকালের কুলীনদের মধ্যে এরূপ দুষ্কার্যকারীর সার্থক প্রতিরূপ বিবাহবণিক ও অধর্মরুচি। অধর্মরুচির নিজের কথায়—'কে হে তুমি 'বে'তে আলিস্যির কথা বলচো? বে কর্ত্তে কি আলিস্যি হয়? গেলেম্—বে কল্লেম—যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম্—চল্যেম্—আর কি? বে অর্কাচব রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্যি আছে?' এদিক থেকে বিবাহবণিক যথার্থই একজন 'মহাপুরুষ'। তার নিবাস শ্বশুরবাড়ি, পডাশুনায় বিদ্যাদিগগজ ('আমি কি ডোম, যে ধর্মশাস্ত্র শিখে ধর্মপণ্ডিত হব?')—বস্তুত সে একজন ধর্মের ষণ্ডবিশেষ। আর তার পেশা—বিবাহ-ব্যবসা। কারণ—'মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন তার হাজাশুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি।' শ্বশুরবাড়িতে আদরের ও আতিথ্যের যে বর্ণনা সে দিয়েছে, তাতে তার ভেতর কুলীন জামাইয়ের নাচতা ও অর্থগৃধ্নুতার প্রকাশ। —'দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণা না পেলে কি সেথা থাকি?' কুলীন অধর্মরুচি মহাশয় বড়ই 'ধর্মভীত', তাই সে সাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ বিবাহ করেনি। কিন্তু—'আমাদ্দাদা মহাশয় চার কুড়ি পোনেরটা 'বে' করেছেন, এখন তিনি অস্তদন্ত হীন হয়েছেন তবু

পেলে ছাড়েন না।' এতগুলি বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্মরক্ষা কিভাবে সম্ভব, ধর্মশীলের এই প্রশ্নের জবাবে অধর্মরুচির স্পষ্ট জবাব—'ধর্মই ধর্ম রক্ষা করেন, আমরা ধর্মাধর্মের ধার ধারিনে, অথবা যার ধর্ম সেই রক্ষা করে।' কৌলীন্যপ্রথার কারণে যে নানারূপ ব্যভিচার ও দুষ্কার্য কিভাবে বিষাক্ত ক্ষতের মত সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়েছিল, বিবাহবণিক ও অধর্মরুচির চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার তার উদাহরণ দিয়েছেন। স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা কুলীন রমণী অসহ যৌবন-যাতনায় পরপুরুষে আসক্ত হয়, গর্ভবতী হয়ে সন্তানও প্রসব করে। কুলীন স্বামী অর্থলোভে সেই সন্তানকে স্বীকৃতি দেয়। অধর্মরুচি তেমনই এক সন্তান। আবার সে-ও তেমনি এক সন্তানের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রিত হয়েছে। নির্লজ্জ কুলীন বামুনের কাছে এ-জাতীয় ব্যাপার নিতান্তই জলভাতের মতো। অধর্মরুচি ও বিবাহবণিকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ধর্মশীলের মন্তব্যের ('সুতরাং তাহারা কি রূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে ? ব্যভিচার দোষে, অবশ্যই লিপ্ত হয়।') উদাহরণ অধর্মরুচি ও ও বিবাহবণিকের মাধ্যমে উদাহৃত হয়েছে—'কি বল্বো বাবা, লজ্জা হয়, সেদেশে প্রায় তিন বচ্ছর যাই নাই, তাই বলি 'মেয়েটা হলো।' (অধর্মরুচি)। আবার বিবাহবণিকের কথায়—'বাপু হে, তাতে ক্ষতি কি ? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ! তা বাপু আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি ?' বিবাহবণিকের চরিত্রে কুলীনদের আরো পরিচয় কীর্তিত হয়েছে। তার টাকার প্রয়োজন, বেলাও অনেক হয়েছে। সুতরাং সে মনে মনে ভাবছে যে, কাছেপিঠে কোন শ্বশুরবাড়ি থাকলে তার দ্বিবিধ উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে। মনে পড়ল কাছেই বিমলাপুর গ্রাম—সেখানে একবার বুঝি বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু সেটা তার নিজের, না পুত্রের—তা সে মনে করতে পারছে না। ফর্দ খুলে দেখা গেল—সে নিজেই সেখানে বিয়ে করেছে। —'লেখাপড়া রাখা ভাল, মনে করে কতো রাখা যায় ? লেখা ছিল, এইতো মনে হলো, নৈলে কি হতো ?' কিন্তু সমস্যা হল—গরীবের ঘর, প্রাপ্তিযোগের আশা নেই। তবে—'ব্রাহ্মণীর কাটন কাটাও কি কিছু নেই ? দেখে আসিনে কেন ?' পথে তার সঙ্গে দেখা হল উত্তমের সঙ্গে। পরিচয়ে জানা গেল সে বিবাহবণিকের পুত্র। উত্তমের কথা—'আমি আজি কৃতার্থ হইলাম—জন্মাবধি পিতৃদর্শন পাই নাই'। বিবাহবণিকের স্বগতোক্তি—'তুমি দর্শন পাবে কি তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই—সেই শুভদৃষ্টি মাত্রই যা হউক। কৈ, অধর্মরুচি বাফা এখন কোথায়,—কন্যা হয়েছে বলে বড়

ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন এসে, আমার এককালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে!' কৌলীন্য-ব্যবস্থায় জঘন্য ব্যভিচারের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি এই অধর্মশীল ও বিবাহ-বণিকের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। এই দৃশ্যের আর একটি ঘটনাও বিশেষ তথ্যপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক। উত্তম পিতাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়, কারণ 'আমি মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম…তাহাতেই আমার মাতাঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন।' এখন পিতাকে আকিঞ্চন করে বাড়িতে নিয়ে গেলে—'মাতাঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে।' কুলীন সংসারের অতি প্রত্যক্ষ, বাস্তবচিত্র নাট্যকার এখানে তুলে ধরেছেন। আবার সেই সঙ্গে বিবাহবণিকের কৌতুকপূর্ণ হৃদয়-বেদনাও এখানে অস্পষ্ট থাকেনি—'(হাস্যমুখে স্বগত) স্বামী স্ত্রীর সকল দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পায না, দেখ আমি কি ভাগ্যবান্ তাহাও স্বচক্ষে দেখি,—হা অদৃষ্ট!'

উদরপরায়ণ সার্থকনামা ব্যক্তি। সে একান্তভাবেই উদরপরায়ণ। নিমন্ত্রণের গন্ধে সে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ায়—'ফলার সন্ধান করি খুঁজিয়া খুঁজিয়া।' তার স্বার্থপরতারও তুলনা নেই—নিমন্ত্রণে সে নিজের ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে যায় ন.: স্ত্রীর প্রতিও তার কোন মর্যাদাবোধ নেই। ন্যায়ালঙ্কার তার সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন—'সুতরাং তোমার পক্ষে ফলার ভাল হইলেই বিবাহ ভাল হয়।'

বিরহীপঞ্চানন ও বিবাহবাতুল—দুটি বিয়ে-পাগলা চরিত্র। বিরহী-পঞ্চানন বিপত্নীক, বিবাহবাতুল—অকৃতদার। তারা কুলীন নয়—ভঙ্গজ। বিরহীপঞ্চানন স্ত্রী-বিরহে কাতর। —হৃদয়ের শূন্যস্থান পূরণের কোন আশা তার নেই-ও। কারণ কুলীনের মত সে বিয়েতে উপঢৌকন পায় না, বরং তাকে দিতে হয়। কুলপালকের গৃহে বিবাহের নিমন্ত্রণে সে যেতে অনিচ্ছুক। কারণ—'আর ভাই প্রজাপতির গন্ধে কায নাই, ঐ গন্ধেই অন্ধ হইয়া সর্বস্ব বিক্রয়পূর্বক সেই বিবাহবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি।' বিবাহবণিকের আক্ষেপ—'আমার যে একবারও হইল না।' তাই সে কামনা করে—'এবার মরিয়া আমি হইব বৈদিক।/ মারিব বল্লালে ঝাঁটা ভাবিয়াছি ঠিক॥ / কানা খোঁড়া আতুর বা হই যদি অন্ধ। / তবু গর্ভে গর্ভে মোর হইবে সম্বন্ধ॥ / পেট থেকে পড়িয়া করিব গিয়া বিয়া। / সংসারের সুখ হবে গৃহিণীকে নিয়া॥ / থাড়ুনাড়া ব্যঞ্জনের কতো বা আস্বাদ॥ / দেখিতে হইবে ভাই মনে বড সাদ॥" এই আক্ষেপ ও কামনার মধ্য দিয়ে আমরা এক ঊষর হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই।

আলোচ্য নাটকে বহু নারী চরিত্র আছে। কুলপালকের চার কন্যা—জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী, কিশোরী। এদের বিবাহ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আলোচ্য নাট্যবস্তুর অবতারণা। এদের মধ্যে জাহ্নবী সবচেয়ে বড়। কন্যাদের বয়স সম্পর্কে কুলপালকের নিজের উক্তি—'বয়সের কথা আর কি বলিব ভাই, বয়স্ কোথা? বড কন্যার অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই, মধ্যমটির সকল কেশও পক্ক হয় নাই, তৃতায় কন্যাও প্রায় মধ্যমটির মত; আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে সূতিকা গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত পৌষ মাসে সবে পঁচিশ বৎসর পড়িয়াছে।"[১] নাট্যকারের নিপুণ তুলিকায় এই চারজনের চরিত্রই অতি নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

কুলপালকের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহ্নবা এখন বিগত-যৌবনা। কুলীনকন্যার দুর্দশার আভিজ্ঞতা সে নিজের জীবনেই লাভ করেছে। দুঃখের দহনে জলে-পুড়ে তার মন এখন অঙ্গারে পারণত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে তার কোন আসক্তি নেই—যৌবনের রোমাঞ্চকর অনুভূতির শিহরণ তার স্তিমিত। বিবাহ সম্পর্কে তার কোন কৌতূহল নেই। চরম হতাশা থেকে উত্থিত একপ্রকার নির্বেদ বৈরাগ্য দ্বারা তার মন যেন এখন আচ্ছন্ন। তাই জাহ্নবী মাকে বলে—'আমি তো যৌবনে জলাঞ্জলি দিচি, আর কতকালই বা বাঁচবো, কেন আর বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ?' এতদিন তার বর জোটেনি। এখন বিবাহ সংবাদে তার মানসিক প্রতিক্রিয়াও আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। যৌবনগতা এই নারার কণ্ঠে শুধু সবিষাদ উক্তি ধ্বনিত হয়—

> জাহ্নবা যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট।
> যাইবে সুন্দর বর সুন্দরের কাট॥
> বরযাত্র তাহে মাত্র যমরাজ দূত।
> বাসর শয়নসুখ হবে অনুভূত॥

ষষ্ঠ অঙ্কে বিবাহের দিন বর আসার সংবাদ শুনেও জাহ্নবীর মনে কোন আনন্দ নেই। সে জানে—কুলীনকন্যা সে, পাত্রের অভাবে তার বিবাহ হয়নি, এখনও

---

১. পরবর্তী সংস্করণে নাট্যকার কুলপালকের কন্যাদের বয়স সঙ্গত কারণেই নিম্নরূপ ধার্য করেছেন--'বড় কন্যার অদ্যাবধি ৩২।৩৩ উত্তীর্ণ হয় নাই, মধ্যমটির বয়স ২৬।২৭, তৃতীয় কন্যাও ১৫।১৬, আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু, বাছা এই পৌষে সবে আট বৎসরে পড়িয়াছে।' (কুলপালক)

যে তার বিবাহ হতে চলেছে, সে শুধু নিয়মরক্ষা মাত্র। তাই বিবাহের উদ্যোগের কথা শুনে সে বলে—

নির্বাণ হইলে দীপ করে তৈল দান।
পলায়িত হলে চোর হয় সাবধান॥
যৌবন বহিয়া গেলে বিবাহ বিধান।
মিথ্যা নয় লোকে কয় এ তিন সমান॥

সত্যই বিবাহ ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ নেই, কারণ—'আমি এখন অস্তদন্ত হীন হয়েছি, এখন 'তীর্থে' যাওয়াই উচিত।...এখন কি আমি 'শিং ভেঙে বাছুরের পালে মিশবো?' ভাবী জীবনসঙ্গী সম্পর্কে নারীমনের স্বাভাবিক কৌতূহল, সলজ্জ অনুরাগের স্নিগ্ধ, মধুর আবেগানুভূতি হৃদয়ে সঞ্জীবিত থাকে। কিন্তু জাহ্নবীর মধ্যে ভাবাবেশ নেই—নিদারুণ দুঃখের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এক প্রেম-বঞ্চিতা নারীর প্রজ্ঞা ও সুস্থ অনুভূতির কুলিশ-কঠোর ভাষা তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই দুর্দশার মূল কারণটিকেও সে ধিক্কার দিতে দ্বিধা করেনি—'আহা কি কুলের গুণ পরিসীমা নাই। / হায় রে বল্লাল তোরে বলিহারি যাই॥'

এতদিন অনূঢ়া থাকার যাতনা সে সহ্য করেছে। তার স্থিতধী মন বুঝেছে—এখন যে বিয়ে হচ্ছে, সে শুধু আইবুড়ো নাম ঘোচানোর জন্য। তাই তার উক্তি—'এ বিয়ে হইলে মাত্র একাদশী ফল॥'

শাম্ভবী জাহ্নবীর পরের বোন। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অনুসারে তার—'সকল কেশও পক্ক হয় নাই।' আর পরবর্তী সংস্করণ অনুযায়ী তার বয়স ২৬।২৭ বছর। তার যৌবন শেষ কিনারায় এসে পৌঁছেছে, তবু এখনো তার রেশ রয়ে গেছে। জাহ্নবীর মত বাস্তব অভিজ্ঞতা তার হয়েছে—কিন্তু স্বপ্নময় পুলকের শিহরণ এখনো সে অনুভব করে। সে জানে—অন্যান্য অনেকের মতোই তাকেও হয়তো অনূঢ়া অবস্থায় জীবন কাটাতে হবে। তাই বিবাহ-সংবাদে সে আশ্চর্যান্বিতা হয়ে গেল—

শাম্ভবীর 'বে' এ যে অসম্ভব কথা।
কুলীন কুমারী মোরা 'ঘর' পাব কোথা॥
বল্লাল বিহিত কুল অকূল সলিলে।
পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মিলে॥

কৌলীন্যের যূপকাষ্ঠে বাংলাদেশের কতশত নারীর জীবন-যৌবন বলিপ্রদত্ত

হচ্ছে তার সব খবর শান্তবা না জানলেও তার আশেপাশে সে একরূপ অজস্র ঘটনা ঘটতে দেখেছে, দেখছে। তার নিজের ও বোনেদের জীবন বল্লালী কুলপ্রথার কালো মেঘে আচ্ছন্ন দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার সাক্ষী। কুলপ্রথা ভঙ্গের অপরাধে সমাজপতিদের অত্যাচারে কত অসহায় পিতা পীড়িত, এও সে জানে। তাই কুলীন-গৃহে জন্মানোর অপরাধ শান্তবী বুঝেছে, তাদের চিরকাল অনূঢ়া অবস্থাতেই থাকতে হবে। কারণ কুলপালক কুলভঙ্গের অপরাধ করবেন না, আবার বল্লালী প্রথার নিদারুণ পাশের বন্ধনও কি ভয়ঙ্কর। সুতরাং তাদের বিয়ে হবে শুনে শান্তবী যেমন আশ্চর্যান্বিতা হয়, তেমনি কুমারীমনের উন্মুখতাও তার ভ্রূভঙ্গিতে ধরা পড়ে। আবার সে বেশ স্পষ্টবাদীও। তাই মাকে সে স্পষ্ট বলে—'মা, আমাদের 'বে' হবে তা বল্লাল তো টের পাবে না?' বল্লালী প্রথা কত মেয়ের জীবনে যে সর্বনাশ ডেকে আনছে, এটা শান্তবী নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছে, তাই সে বলে—'সে মলে কি হবে মা? তাচ্চেয়ে তার চেলা বড়, তারা মেলা বেড়াচ্ছে দেখিস্।' মা তাকে সান্ত্বনা দেন—'আমি কুল রক্ষা কর্বো, কুলীন বর এসেছে।' শান্তবীর মর্মান্তিক অথচ বিষাদপূর্ণ স্পষ্ট জিজ্ঞাসা—'ওমা তুই কি কুল রক্ষা কর্বি, তবে জাত রক্ষা কে কর্বে মা?'

এই মর্মান্তিক সত্যটি মুখরা শান্তবী তার মায়ের সামনেও তুলে ধরতে দ্বিধা বোধ করেনি। কুলপালকরা কুলরক্ষার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি, জৈবিক চাহিদার প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই, আর এই বক্রপথ দিয়ে সমাজে কত পাপ, অনাচারের বিষ প্রবেশ করছে, কত অসহায় নারী রক্ষণশীলতার নিষ্ঠুর পীড়নে গুমরে গুমরে নিঃশেষিত হচ্ছে, নাট্যকার এই অমোঘ উক্তির মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করলেন। শান্তবীর এই প্রশ্নের ভিতর দিয়ে একদিকে কৌলীন্য-প্রথার অন্তঃসারশূন্যতা, অন্যদিকে স্বাভাবিক জৈবিক বৃত্তিসম্পন্ন অথচ বঞ্চিত নারীসমাজের জীবনবেদনার সমুচ্চ প্রকাশ।

ষষ্ঠ অঙ্কে বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন দেখে শান্তবীর মন উৎফুল্ল—এতদিনে সত্যই তাদের বিয়ের ফুল ফুটবে। বিস্ময়, আনন্দ, চাপা উল্লাস তাকে ঘিরে ধরেছে। বিবাহ ব্যাপারে জাহ্নবীর শীতলতার মনোভাব শান্তবীর নেই। তার মনোভাব—'হোক না, দেখা যাক্।' জাহ্নবী যখন বলে—'এখন কি আমি শিং ভেঙে বাছুরের পালে মিশবো?' তখন শান্তবী উত্তর দেয়—'দিদি, ক্ষতি কি? হলোই বা।' দুঃখময় বর্তমানকে ছেড়ে অজানা ভবিষ্যতকে বরণ করে নেওয়ার মনোবল ও আগ্রহ শান্তবীর রয়েছে। বর বুড়ো, থুথ্‌থুরে—একথা শুনে শান্তবী

জাহ্নবীকে প্রস্তাব দেয়—'তা চল্ না ভাই, ঘরে গে বাবাকে বলি এমন বে কি না দিলেই হয় না?' শাম্ভবীর এই উক্তির মধ্য দিয়ে নারীমুক্তির আকুতি এবং সামাজিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে নারীমনের সচেতন বিদ্রোহের অস্ফুট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

শাম্ভবী স্পষ্টবাক্। তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য যে তার পিতাই দায়ী, একথা স্পষ্ট করে বলতে দ্বিধা করে না। অন্যায়কে নীরবে মেনে নেওয়ার পাত্রী সে নয়। তাই কামিনী যখন বলে—'সেই বল্লালে বেটাই যত নষ্টের গোড়া', তখন শাম্ভবীর স্পষ্ট জবাব—'সে কি? ও কথা বলিস্‌নে বাবারই সব দোষ, তিনি কেন কুলের কাঁটা-ফেলে যোগ্য বরে আমাদিগকে দিলেন্ না?' পিতার বিরুদ্ধে শাম্ভবীর এই স্পষ্ট অভিযোগ নীরব অভিমানের সুরে ধ্বনিত হয়েছে সন্দেহ নেই। আর এই বিবাহের ফল যে কি, শাম্ভবী তাও জানে, শেষপর্যন্ত জাহ্নবীর মুখ দিয়েই সে, আবার সে-কথা বলিয়ে নেয়। বস্তুত শাম্ভবী চরিত্রটি স্পষ্টবাক, প্রতিবাদমুখর, বাস্তবমুখী চরিত্র হিসাবে যথেষ্ট উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

কুলপালকের তৃতীয় কন্যা কামিনীর বয়স ১৫।১৬ বছর। সদ্যপ্রস্ফুটিত-যৌবনা এই নারীর দেহে কৈশোর ও যৌবন—এই দুইয়ের আলো-আঁধারি রহস্যলীলার বৈপরীত্য লুকোচুরি খেলা করছে। বিবাহ-প্রসঙ্গে সে রঙিন কল্পনার জাল বোনে। তাই সে মায়ের মুখে তাদের বিয়ের কথা শুনে নবযৌবনোদ্গতা কামিনীর মত সোৎসুকা, চঞ্চলা। বরের প্রসঙ্গে শুনবার জন্য অধীরা হয়ে ওঠে।

কি বল্লি কি বল্লি মা সত্য করি বল।
শুনিয়া এ শুভ কথা হয়েছি চঞ্চল॥
কোথা বর বাসা কোথা এসেছে কি বর।
কবে হবে আজি নাকি বল গো সত্বর॥
বরের বয়স কত দেখিতে কেমন।
যাহোক হলেই হয় এই আকিঞ্চন॥

কিন্তু মায়ের কথায় সে বিশ্বাসও রাখতে পারে না। কেননা, ইতোপূর্বে মা অনেকবার তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে। যৌবনের আগমনে কুমারী-হৃদয়ের গোপন মনে অনেক রঙিন কল্পনার মাধুরী তাকে বিভোল করে তুলেছে, কিন্তু বারে বারে তার স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেছে। মা নতুন করে আবার ছলনা করছে কিনা, এ-বিষয়ে তার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। আবার সেই সঙ্গে নিজের যৌবন-যাতনা অসঙ্কোচে সালঙ্কার প্রকাশেও সে দ্বিধা করেনি—

এমন দুরন্তকালে জ্বলি কামানলে।
তিনকুলে কেহ নাই দুটো কথা বলে॥
সহিতে না পারি আর কর গো উপায়।
কতকাল ভুলাইয়া রাখিবি আমায়॥

মা তাকে বোঝান যে, এবার সত্যিই তাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে। তখন কামিনী উৎসুক হয়ে বলে—'ও মা সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে? বাসা দিচ্ছিস্ কোথায় মা। চুপি চুপি দেক্‌তে গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা?' কামিনীর এই উক্তিতে তার সোৎসুক হৃদয়ের কামনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। সেটি আরো স্পষ্ট হয়, যখন সে বলে—কিশোরী যখন অনুপস্থিত, তখন তারই আগে বিয়ে হোক—'না মা সে ডাক্ শুন্‌লে না, তার এখন কাযনি আমারই আগে হৌক্, তারপর তবে তার হবে।' এখানে বিবাহ-উন্মুখ যৌবনবতী নারীর ব্যগ্রতা লক্ষণীয়।

বিবাহের পূর্বে বর এসেছে। বর সম্পর্কে কুমারী কন্যার সলজ্জ অনুরাগ ও দেখবার জন্য আকুলতা কামিনীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সংসারের জটিলতার বাস্তব রূপের সঙ্গে এখনো তার সম্যক পরিচয় ঘটেনি। তাই বিবাহিত জীবনের অনাস্বাদিত-পূর্ব রোমান্টিক প্রণয়-মধুরতার স্বপ্ন সে এখনো দেখে। কিশোরী বর দেখে এসেছে। কামিনীরও বরের রূপ-গুণের কথা শুনবার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ পায়—'বল্‌না বোন্? কেমন-- কি কচো—কোথা আছে।' কিশোরীর মুখে বরের কুৎসিত রূপ ও বদ্‌গুণের কথা শুনেও সে আশাহত হয় না। যতই হোক, তবু তো কুমারীজীবনের বিবাহের স্বপ্ন সফল হবে—'তুই বুঝিস্‌নে হওয়া ভাল রে।' বিবাহের পর নারীধর্মরক্ষার তবু একটা ভিন্ন উপায় তো পাওয়া যাবে—কামিনী এই উক্তিতে হয়ত সেই আভাসই দিতে চেয়েছে। তাছাড়া তাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য সে পিতার উপরে কোন দোষ চাপাতে চায়নি, বল্লালের কৌলীন্য-প্রথাই যে এ সবের মূলে—এ অভিমত সে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছে—'বাবা কি কর্ব্বে ভাই? তাঁর দোষ কি? সেই বল্লালে বেটাই যতো নষ্টের গোড়া।' এখানে পিতার প্রতি তার ভক্তি ও বিশ্বাসের সুরটি উচ্ছকিত হয়ে উঠেছে।

কুলপালকের কনিষ্ঠা কন্যা কিশোরী, সংশোধিত পাঠ অনুযায়ী, বয়সে নিতান্তই বালিকা,—'এই পৌষে সবে মাত্র আট বৎসরে পড়িয়াছে।' এখন তার লুকোচুরি খেলার বয়স—বালিকা বয়সের রঙিন স্বপ্নে এখন সে বিভোর।

ব্রাহ্মণী যখন মেয়েদের বিয়ের খবর দিচ্ছে, তখন সে পাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল। মা ও দিদিদের ডাকে সে যখন বাড়ি এল, তখন তার মুখে একদিকে বালিকা-বয়সের সরলতা, অন্যদিকে অভিজ্ঞ বয়সের প্রগল্‌ভতা প্রকাশিত। তার মুখে ছড়াটি এইরূপ—

প্রফুল্ল বকুল কুল, গন্ধে গন্ধে অলিকুল,
অনুকূল মলয় পবন।
প্রবোধ না মানে মন, সদা করে আকিঞ্চন,
বল্লালের দিতে বিসর্জন।
কুলে কালি দিয়ে কালা বলে চলে যাব কালি,
ঘটকালী কি করিবে আর।
যৌবন অমূল্য ধন, করিব গে বিতরণ,
নাহি ভয় থাকিবে কাহার॥

বলাবাহুল্য এই পদ্যে কুলীনকন্যার অবদমিত কামনা কিভাবে অবিহিত পথে পূরণ হয়, তার প্রকাশ। কিশোরীর মুখে এ ছড়াটি মানায়নি সত্য। কিন্তু অনুমান করা যায় যে, ছড়াটি সে পাড়ায় খেলতে গিয়ে অর্থ না বুঝেই কোন সখির কাছে শুনে শিখে নিয়েছিল। কৌলীন্য-প্রথার সর্বনাশা রূপ যে-ভয়াবহতার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় সমাজ-জীবনে যে-অধোগতির সূচনা হয়েছিল, একটি কিশোরী কন্যার মুখে তার সংকেত দ্যোতিত করে নাট্যকার কৌলীন্য-প্রথার সর্বনাশা পরিণামের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। কিশোরীর মুখে প্রদত্ত ছড়াটি শিশুর পাকামি মনে হলেও নাট্যকার সচেতনভাবেই পচনের মাত্রা বোঝানোর জন্য দিয়েছেন।

তবে একথাও ঠিক, নাট্যকার কিশোরীকে কোন বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। মা ডাগর মেয়েকে হুটহাট বাইরে যেতে বারণ করলে মেয়ে 'কেন নিন্দে কর্ব্বো' তা বুঝতে পারে না। সে শুভকর্ম কি, বিবাহ কাকে বলে, জানে না! চার বোনের সঙ্গে মায়েরও কেন বিয়ে হবে না, সে বুঝতে পারে না। কার সঙ্গে তার মায়ের বিয়ে হয়েছে, তাও সে জানে না। কিশোরীর এই অবোধপনা তার চরিত্রের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। 'বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই'—ব্রাহ্মণী স্নেহবশে কন্যাকে যতই একথা বলুন, কিশোরীর কথাগুলো একটু 'ন্যাকামি' বলেই মনে হয়।

ষষ্ঠ অঙ্কে বর দেখবার পর কিশোরীর মুখে বরের বর্ণনা* তার পাকামোর নিদর্শন। নাট্যকার এ-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাই এ দৃশ্যে তিনি কিশোরীর সংলাপ কামিনীর মুখে বসিয়েছেন পরবর্তী সংস্করণে। কিন্তু বক্ষ্যমান প্রথম সংস্করণে কিশোরী-কামিনী-জাহ্নবী-শাম্ভবী সংলাপে কিশোরী চরিত্রের বয়স পঁচিশ বছর অথবা পরবর্তী সংস্করণের আট বছর কোনটাই সঙ্গত মনে হয় না। বস্তুত কিশোরী চরিত্রকে নাট্যকার তাঁর বক্তব্যের বাহন করে তুলেছেন মাত্র।

ব্রাহ্মণী কুলপালকের স্ত্রী। এতদিনে কন্যাদের বিবাহ স্থিরীকৃত হওয়ায় তার আনন্দের সীমা নেই। জননী-জীবনের অন্যতর সার্থকতায় তিনি আজ গর্ব অনুভব করছেন। মেয়েদের পাত্রস্থ করতে পারার আনন্দ, প্রতিবেশীদের কাছে গর্ববোধ, নারীমনের চিরন্তন কামনা—সব ব্রাহ্মণীর হৃদয়কে আজ উল্লসিত করে তুলেছে। সুতরাং—'আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে।/ শরীর জুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে॥"—হোক সে জরদ্গব, বৃদ্ধ, কুলীন, তবু তো জামাই। এবং তাকে ভুলিয়ে বশ করবার জন্য ব্রাহ্মণী কতই না স্বপ্ন দেখেন। সংসারের কর্ত্রী হিসাবে তার ব্যস্ততারও সীমা নেই—'আজি আমার নানান্ কর্ম। আজি আমার এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমবার সময়? কিন্তু ঘুমেরও দোষ নাই, সমস্ত রাত উয্যাগ সংযুগ কত্তে জেগে ছিলাম, যেমন্ ভোর বেলা পাঁউচি অমনি মরে ঘুমিইচি, তাইতেই অনেক বেলা হয়েচে, তা এখন আমি কি কারি? অনেক কম্ম।' কোন্টা ছেড়ে কোন্টা আগে করেন, তাই ভেবেই ব্রাহ্মণী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যাহোক, মেয়েদের ডেকে তাদের খবর দিলেন, কারণ—'তাদ্দের 'বে', তারাও এখন টের পায়নি।' ব্রাহ্মণী উল্লাস প্রকাশ করেন—'ওগো, তোদের 'বে' হবেগো, 'বে' হবে।' জাহ্নবীকে তিনি বোঝান—'বাছা, এমন্ কথা বলতে আচে? কিসের বয়েস? কাঁচ ছেলে। ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস।' শাশ্বত জননী-হৃদয় সন্তানকে চিরকাল শিশু হিসাবেই দেখে থাকে। শাম্ভবীকে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন—'আমি কুলরক্ষা কর্ব্বো, কুলীন বর এসেচে।' কিন্তু শাম্ভবীর—'তুই কি কুলরক্ষা কর্ব্বি, তবে জাত রক্ষা কে কর্ব্বে মা'—এই মর্মভেদী প্রশ্ন ব্রাহ্মণীকেও ক্ষণকালের জন্য মূক করে দেয়। কন্যাদের মর্মবেদনা তিনিও মর্মে মর্মে অনুভব করেন। কিন্তু উপায় নেই। যে সমাজে নারীজাতি পুরুষের

*পরবর্তী সংস্করণে এই অংশটুকু নাট্যকার কামিনীর মুখে বসিয়েছেন। কিশোরীকে তিনি এ দৃশ্যে অনুপস্থিত রেখেছেন।

দাসীমাত্র, নারার পৃথক সত্তার যেখানে মর্যাদা নেই, সেখানে বঞ্চিত নারীহৃদয়ের নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। ব্রাহ্মণী অধোমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাম্ভবীকে বলেন—'ওমা শাম্ভবি, তোর একথার কি উত্তর দিব? তার নিমিত্তে বলেছিলাম গো, বলেছিলাম সেই মিন্সেরে, বলি 'হেদে ভাল বর দেখে মেয়েগুলোর বে দিস', তা বাছা, আমি বল্যে কি হবে? সে 'কুল' খোঁজে, বলে 'কুল থাক্‌লেই সব থাকে'।' স্বামী তাকে বুঝিয়েছে, মেয়েদের জাতরক্ষা করা মা-বাবা, অন্যথায় রাজার, কর্তব্য। স্বামীর ব্যক্তিত্ব, তথা একগুঁয়েমির কাছে ব্রাহ্মণী অসহায়। সুতরাং নিরুপায় হয়েই তিনি গতানুগতিক জীবনকে মেনে নিয়েছেন। মেয়েকে তাই বোঝান—"শাম্ভবী, ক্ষামা কর, 'জাত-রক্ষাব কায নাই, কুলরক্ষায় সম্মত হ।" কিন্তু যন্ত্রণার দাবদাহে তিনি নিজেই দগ্ধ হচ্ছেন. তাঁর কথা শুনলে এটা বেশ বোঝা যায়। বল্লাল প্রবর্তিত কুলপ্রথা যে সমাজে সর্বনাশ সাধন করছে, আর তার ফলেই মেয়েদের 'জাতরক্ষা' সম্ভব হচ্ছে না—ব্রাহ্মণী এ-বিষযে সচেতন। নারীর সতীত্ব ও মর্যাদারক্ষার দিকে আজ কারো নজর নেই—'মা বাপ, রাজা, ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাত নষ্ট কত্যে বসেছে তখন জাতরক্ষা আর কে কর্ব্যে মা?' মেয়েদের মনোকষ্ট তিনি বোঝেন। এ বিবাহকে মেয়েরা মনের সঙ্গে মেনে নিতে পারেনি। তাই মেয়েদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন 'আবার কেন নিঃশ্বাস ফেলে অধোমুখে রহিলি? কি কর্ব্যো, মনোদুঃখ করিস্‌নি।'

যে-বরই হোক, মেয়েদের বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাই ব্রাহ্মণী উদ্যোগ-আয়োজনে মেতে ওঠেন। পাড়ার সকলকে আপ্যায়নেও তার ত্রুটি থাকে না। আবার সুযোগমত তাদের সঙ্গে হাসি-তামাশাও তিনি করেন। বিয়ের কোন ঘটা নেই কেন বলে প্রতিবেশিনীদের কটাক্ষের উপযুক্ত জবাব দেন ব্রাহ্মণী—'আর ভাই ঘটা, কুলীনের মেয়ের 'বে' ঘটাই ভার, আবার 'ঘটা' পাবো কোথা বোন্? তবে তোরা এসেছিস্ এই ঘটাই 'ঘটা'।'

বহু নারী চরিত্রের মধ্যে ফুলকুমারী ও যশোদা—এই দুটি ট্রাজেডি-করুণ চরিত্রও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। যশোদা বালবিধবা, বৃদ্ধা, ফুলকুমারী বিবাহিতা হলেও স্বামী-সৌভাগ্যবঞ্চিতা। ফুলকুমারী কুলীনকন্যা, কুলীনপত্নী। কিন্তু স্বামীর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তার হয়নি, হয় না। বহুপত্নীক স্বামী আসে শুধু পাওনা আদায়ের জন্য। তার জীবনে স্বামী না আসা যেমন যন্ত্রণাদায়ক, তেমনি আসাও—'কালামুখো বিধি ভাল মিলাইল ভালে।' তার আরো কথা—

'গেডেচ্চ্যাও কি স্বর্গ দেখে? তেমন কপাল হলে কি কাল কুলীনের হাতে পড়িতাম? আমাদের যেমন কপাল তেমনি মিলেছে!' গতকাল ফুলকুমারীর স্বামী এসেছিল। প্রেমবঞ্চিতা ফুলকুমারী স্বামীকে ঘিরে কতই না সুখস্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু স্বামী মহারাজ এসেছে শুধু পাওনা আদায় করতে। ফুলকুমারী—'কাটনাকাটা কড়ি যত করিনু বাহির ॥/ যা ছিল আমার পুঁজি দিলাম সকল।' কিন্তু স্বামী তাতেও খুশী নয়। তিনি স্ত্রীকে ফেলে ক্রোধভরে শ্বশুরের টোলে গিয়ে রাত্রিবাস করেন। আর ফুলকুমারী—'একাকিনী বিরহিনী যামিনী জাগিয়া।/ নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥' আসলে, কৌলীন্য-প্রথার নিষ্ঠুর বেদীতে আবদ্ধ হাজার হাজার কুলীনকন্যার প্রতীক ফুলকুমারী। তার যন্ত্রণা-মুখর উপলব্ধি—'এ থাকাচেয়ে না থাকা ভাল। না থাকলে মনে প্রবোধ দেওয়া যায়, এ থেকে নেই। একি সামান্যি দুঃখু?' স্বামী থেকেও নেই, নারীজীবনের এ দুঃখ যথার্থই সীমাহীন। সঞ্চারিনী, পল্লবিনী লতার মতই নারী স্বামীকে অবলম্বন করে জীবনকে সার্থক করে তুলতে চায়। কিন্তু কুলীনবধূগণ সে সৌভাগ্য থেকে চিরবঞ্চিতা। ফুলকুমারী একরূপ সীমাহীন দুঃখের দহনে তুষের আগুনের মত নিরন্তর জ্বলেপুড়ে মরছে।[১]

অথচ এই দুঃখের নিরন্তর জ্বালাও তার হৃদয়ের সরস প্রস্রবণকে রুক্ষ, শুষ্ক করে তুলতে পারেনি। যশোদাকে সে ঠানদিদি বলে ডাকে। তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে তার এই রসবোধের প্রকাশ।

পল্লীগ্রামের রক্ষণশীল সমাজের অশিক্ষিত নারীর মুখের সে ঠাট্টা হয়ত এ যুগের শিক্ষিত সমাজের চোখে অমার্জিত (Vulgar) মনে হতে পারে, কিন্তু সেই পরিহাসের মধ্যে ফুলকুমারীর বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌চাতুর্যও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

যশোদার চরিত্রটিও নাট্যকারের চরিত্রসৃজন নৈপুণ্যের উদাহরণ। যশোদা বালবিধবা। হয়ত এমন বয়সে সে স্বামীকে হারিয়েছিল, যখন স্বামী কি বস্তু সে জানে না। তদুপরি সে কুলীনকন্যা। স্বামী থাকলেও তার ভাগ্য অন্যান্য

১. 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য স্ত্রী চরিত্র ফুলকুমারী। কুলীন-কন্যার বঞ্চিত জীবনের নানাদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইবার প্রয়াস যে এই নাটকে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, এই চরিত্রটি তাহার প্রমাণ।'

বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৫৫।

কুলীনবধুর মতই হত সন্দেহ নেই। তবু শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও এই বর্ষিয়সী নারী আপনার মনের সজীবতাটুকু হারায়নি। তাই ফুলকুমারীর সঙ্গে সে সহজেই হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠতে পারে সমানভাবে। কুলপালকের মেয়েদের বিয়েতে আগত পুরনারীদের সঙ্গে যশোদাও আছে। একটি শুভ উৎসবকে কেন্দ্র করে সমবেত পুরনারীদের আনন্দ-কলতানে যশোদাও যোগ দেয়। অন্যান্য পুরনারীর সামনে স্বামীর যে বর্ণনা সে দেয়, তাতে একদিকে তার কৌতুকবোধ, অন্যদিকে অতিগভীর বেদনাঘন দীর্ঘশ্বাস ব্যঞ্জিত হয়। 'তার বয়সের সম, পাহাড় পর্ব্বত কম, আছে কিনা ভুবন ভিতরে'—এহেন ব্যক্তির অন্তর্জলি যাত্রাকালে তাদের সাত বোনকে একত্রে বিয়ে দেওয়া হয়। অচিরেই বর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় —ফলে যশোদারা বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং—

তখনি বৈধব্য দশা, প্রাপ্ত হয় সপ্তস্বসা,
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব॥
বল্লাল হইয়া কাল, দিয়াছে কুলের শাল,
সামাল ২ ডাক ছাড়ি।
না হলো বাসনা পূর্ণ, কেবল বৈধব্য তূর্ণ
মন্ত্রের প্রভাবে উদম বাঁড়ি॥

বিবাহিত জীবন কি জানল না, অথচ বৈধব্যজীবনের একাদশী 'সর্বনাশী নাহি ছাড়ে দেশ॥'

যশোদা হাস্যোজ্জ্বল চরিত্র। নিজের বুকের দুঃখের পাহাড় চাপা দিয়ে সে সকলের সামনে মুখে হাসি ফোটায়। কিন্তু নির্জনে সে উদ্গত দীর্ঘশ্বাসকে চেপে রাখতে পারে না—আপন দুর্ভাগ্যের জ্বালা-যন্ত্রণা সে নিজেই ভোগ করে— 'এই যে সকলেই গেল। যাবে না কেন? ঈশ্বর যেতে দিলেন তাই যাচ্চো! আমি যে আহ্লাদ-আমোদ কর্ব্বো তার তো যো নেই। যাই ঘরে যাই, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি কর্ব্বো!' যশোদার নীরব দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়েই তার হাহাকারের অন্তহীন বেদনা পরিব্যাপ্ত।

যশোদা সহানুভূতিশীলা নারী। নিজের দুর্ভাগ্যের কষ্টিপাথরে সে ফুলকুমারীর বঞ্চিত জীবনের বেদনাকে অনুভব করে। তার প্রতি যশোদা সমবেদনা অনুভব করে। ফুলকুমারীর দুঃখের কথা সে শুনতে চায় তার মনের ভার লাঘব করবার জন্য—'আমার যখন যে দুঃখ হয়, সম্পর্ক বুঝে বলে থাকি—বল্লিই ভাল, যত মনে রাক্বে ততই মন্দ, বলে ফেলো মন খোলসা পায়—।' কিন্তু ফুলকুমারীর

দুর্ভাগ্যের কথা শুনতে শুনতে তার নিজেরই যন্ত্রণায় বুক ফেটে যেতে চায়—'নাত্‌নি আর বলিস্‌নে—বলিস্‌নে, বুক ফেটে যায় !!!' অক্ষম আক্রোশে যশোদা প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়ে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তক বল্লালের উদ্দেশে—'হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি ? কে তোকে কুলের সৃষ্টি কত্তো বলেছিল ? কুল তো নয় এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন !' তারপর আবেগ সংবরণ করে যশোদা নাতিনী সদৃশা ফুলকুমারীকে নানা স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দিতে থাকে।

যশোদা বয়সে প্রবীণা। কিন্তু বিবাহ-মুহূর্তেই স্বামী-সৌভাগ্যবঞ্চিতা এই নারীর মনে গোপনে বুঝি বা একটু কামনার ইঙ্গিত ঝিলিক দিয়ে যায়। ফুলকুমারীর মুখে বিধবা-বিবাহের আইনের কথা শুনে—'(সবিষাদে) আর ভাই, হবে হবেই শুঙ্কি, হয় কৈ ? আমি থাক্তে আর হবে ? আমার তেমন অদেষ্ট নয়। না হোক্‌গে, আর কাযও নেই।' পরিমিত পরিসরে হলেও যশোদা চরিত্রটি সার্থকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বলা যায়।

সুমতি উদরপরায়ণের পত্নী। তার জীবনও বড়ই দুঃখময়। স্বামী নিষ্কর্মা, বাউণ্ডুলে—নিমন্ত্রিত, রবাহূত, অনাহূত—যে কোন নিমন্ত্রণের আসরেই তার ত্বরিৎ উপস্থিতি। স্ত্রী-সন্তানের দিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ফলে সুমতির জীবন দুর্বিষহ। তার স্বামী 'ভাত দেওযার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই'। সুমতি 'মেয়েমানুষ', তাই পুরুষ-শাসিত সমাজে তার গতিবিধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। স্বামীর গর্জনের উত্তরে সে সভয়ে বলে—'ফলারের কথা বল্‌তে এসেচি।' তাতেই সে স্বামীর লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। সন্তানের জন্য সুমতির প্রবল স্নেহ। সেজন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করে ছেলেকে নিমন্ত্রণে নিয়ে যেতে। কিন্তু স্বামী-দেবতাটি যে কি চিজ, সেটা বুঝতেও তার বাকি থাকে না ! তবু ঈষৎ ক্রোধে সে স্বামীকে বলে—'আঃ, নে যাওনা কেন—ওকি তোমার ভাগ কেড়ে খাবে ? ছেলে মানুষ, কাঁনচে।' ছেলেকে বকলেও সুমতির জননী-হৃদয় তার প্রতিবাদ করে—'ছেলেমানুষ, কি জানে, এত তাড়না কর কেন ?' কিন্তু ছেলে ভালোমন্দ খেতে পারল না, এরজন্যই মায়ের প্রাণ শেষ পর্যন্ত ব্যথায় গুমরে মরে।

মহিলা ও সুমতি—চরিত্র দুটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে—মহিলা কুলীন-কন্যা। কুলীন স্বামী সম্পর্কে তার কোন মোহ বা সংস্কার নেই—'তাহা দ্বারা দুঃসহ যৌবন যাতনা হইতে তো নিস্তার পেলেম না, তবে সে কি পতি ? তাকে

পতি বলবো কেন ?' সুতরাং মহিলার ভাষায় কুলীন স্বামী—'সে আমার পতি নয়, সে কেবল অধর্ম্মেই পতিত।' সুতরাং তার দুর্ভাগ্য অন্যদের মতই। কিন্তু সরস মদনবাণে বিদ্ধ হয়ে চুপচাপ বসে থাকবার পাত্রী যে মাধবী নয়, তা তার কথাবার্তাতেই বুঝা যায়। মদনদেবের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে মহিলা মাধবীকে যথোচিত জ্ঞানদান করে বুঝায় যে,—'সে দুর্জয় মদন কি না করিতে পারে ? এই বিশ্বসংসারে তাহার অসাধ্য কি আছে ?' তাছাড়া দুঃসহ যৌবন যাতনা নিবৃত্তির জন্য অন্য পথ ধরেছে। মাধবীকেও সে বলে—'তুইও আমার মতে আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেছিস্ ?' মহিলার কাছে পরপুরুষ, আপন পুরুষ বলে কিছু নেই—'পুরুষ হলেই হয় আমি যা বুঝি।' পরকালের চিন্তাও সে করে না। তার মনোভাব এরূপ—'অমূল্য যৌবনধন, পরে হবে বিতরণ / পর নিয়া থাকা চিরদিন।/ পরের সঙ্গের সঙ্গী, পররঙ্গে সদা রঙ্গী / দেখ সখি পরে পরাধীন॥' মাধবীকেও সে সেই পিচ্ছিল পথে পা বাড়াতে বলে। লোকনিন্দার ভয় তার নেই, এমনকি গর্ভ হলেও কোন বিভ্রাট সে দেখে না। তার কথা—'বিভ্রাট কি ? তা হয় অপূর্ব একটা মুখুয্যা হবে।' মাধবা লোকনিন্দা, অধর্ম প্রভৃতিব ভযে ওকাজ করতে ইতস্তত করলে মহিলা বলে—'এতেই লোকনিন্দা কি ? কুলীনের মেয়ে গঙ্গাজল ধুয়ে খায় এমন কে আছে ? আমি দুইবার ওকর্ম করেছি বটে, এখন আর হলে কখন কর্ব্যো না।' অর্থাৎ লোকলজ্জার ভয়ে সে আর গর্ভপাত করবে না। মহিলার চরিত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, নিজের দুষ্কর্মকেও জোরের সঙ্গে করবার মনোবল তার রয়েছে। সমাজ-সংসারকেও সে বাস্তবচক্ষু দিয়ে ভালোভাবেই চিনে নিয়েছে। কুলীনের ঘরে বিবাহিতা কন্যা স্বামী-সঙ্গ-সুখ-বঞ্চিতা অবস্থায় মদনবাণে জর্জরিত হয়ে কোন্ পথে যায়, এটা মা-বাবা বিলক্ষণ জানেন। তাই মাধবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে—'তুই বড নেকা, তাঁরা কি জানেন না ? যখন কুলীনকে দেন তখনি জেনে থাকেন।' মহিলার বাক্চাতুর্যও লক্ষণীয়। মাধবী 'এখন আমি কি করি' বলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বজডিত হলে সে চটপট উত্তর দেয়—'আমার সঙ্গে শ্রীহরি, আর কি করি ?' উত্তরটি দ্ব্যর্থবোধক। মহিলা, স্বৈরিণী ধরনের হলেও বেশ বলিষ্ঠ চরিত্র।

মাধবীও কুলীনকন্যা, কুলীনবধূ। কিন্তু সে স্বামীসোহাগবঞ্চিতা হলেও সতীত্বধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। মাধবী শিক্ষিতা—পুরাণ-পুঁথিতে সে দুর্জয় মদনের প্রতাপ সম্পর্কে অনেক কাহিনী পড়েছে—নিজেও সে মদনের জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। 'যে পুরুষ যাহাকে বিবাহ করে সেই তার পতি'—সতী নারী

মাধবীর অভিমত। কিন্তু মহিলার সঙ্গে নিভৃত আলাপে মাধবী জীবনের অন্য পথের সন্ধান পায়। কিন্তু তার মনে তখনো ধর্মবোধ—'তাই ভাবি, অল্পকালের নিমিত্ত পরকালটা নষ্ট করিব?' কিন্তু মদনদহনে পীড়িত মাধবী মহিলার প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়, তবু তখনো লোক-নিন্দার ভয় তার মধ্যে রয়েছে। এই গোপন অভিসার বিষয়ে লোকে জানতে না পারলেও গর্ভসঞ্চার হলে তো জানতে পারবে? সুতরাং সে 'ও কর্ম করাও' অর্থাৎ গর্ভপাতের ইঙ্গিত করে। মাধবী দুর্বল চরিত্রের মানবী। তাই অবৈধ প্রেমের যাথার্থ্য স্বীকার করলেও দুর্নামের ভয় সে করে। শেষপর্যন্ত 'এখন আমি কি করি'—এই প্রশ্নাত্মক বাক্যের মধ্য দিয়েই মাধবীর চিত্তবৃত্তির গতি কোন্ পথে ধাবিত হতে চলেছে, তা বুঝা যায়। বস্তুত কুলীনকন্যারা কেন ও কিভাবে অন্ধকারের পথে পা বাড়ায়, মহিলা ও মাধবী—এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার সেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

স্বল্পপরিসরে অঙ্কিত রসিকা চরিত্রটিও মনোযোগের দাবী রাখে। রসিকা নাপিতানী নবীনা যুবতী, সে স্বামীহারা হলেও—'তবু কভু দুঃখ নাহি জানি।' সে যথার্থই স্বৈরিণী, তার ঘরে—'অতিথি না ফেরে এই ধর্ম।'…'তৃষিত পথিকগণ, এসে করে আকিঞ্চন', আর—'ভালোবাসে সবে অতি, আমি শুদ্ধমতী সতী, রজনীতে নাহিক কামাই।'—অধিক বিবরণের প্রয়োজন নেই, রসিকার কথার সামান্য অংশ থেকেই তার স্বভাব-চরিত্রের যথার্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। দেবলের সঙ্গে কথোপকথনে তার বাক্‌চাতুর্য ও লাজলজ্জাহীনতার পরিচয়ও বেশ পাওয়া যায়। সেকালের কৌলীন্যপ্রথা-তাড়িত সমাজে এরূপ 'ডাস্টবিন'ও ছিল। সেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরতেই রসিকা-দেবল পর্বের উপস্থাপনা। এছাড়া এই পর্ব, এবং চরিত্র দু'টির যথার্থ কোন নাট্যোপযোগিতা নেই।

সংলাপ

সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপের সহায়তায় নাট্যকাহিনীর গতি ঘাত-প্রতিঘাতময়, দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত মোহনার দিকে অগ্রসর হয়। যে সংলাপ চরিত্রের অন্তর্ময়তাকে দ্যোতিত করে, ঘটনাকে বিশ্লেষিত করে তাকে পূর্ণ রসসিদ্ধির পথে চালিত করে, তাই যথার্থ নাট্য-সংলাপ। সাধারণ কথোপকথন থেকে নাট্য-সংলাপের দুস্তর ব্যবধান। সমালোচকের কথায়—'A snatch of phrase caught in everyday conversation may mean little. Used by an actor on a stage, it can assume general and typical

qualities. The context into which it is put can make it pull more than its conversational weight, no matter how simple the words.…Poetry is made from words which may be in use in more prosaic ways; dramatic speech, with its basis in ordinary conversation, is speech that has had specific pressure put on it.'[১] সংলাপ সম্পর্কে উপর্যুক্ত মন্তব্যটি 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের সংলাপ আলোচনাকালে স্বতঃই মনে আসে। বস্তুত আলোচ্য নাটকে রাম-নারায়ণ প্রাণচঞ্চল সংলাপের সাহায্যে নাট্যকাহিনীকে গতিবেগসম্পন্ন, চরিত্রকে জীবন্ত এবং পরিস্থিতিকে সার্থক, সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের মাধ্যমে রামনারায়ণ মৌলিক বাংলা নাটকের স্বর্ণদ্বার খুলে দিলেন। এর আগে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক প্রকাশিত হয়—তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' এবং জি. সি গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'। প্রথমটি প্রথম বাংলা মৌলিক কমেডি, দ্বিতীয়টি ট্রাজেডি। ইতিহাস বিচারে যাই বলা যাক, কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, নাট্যদ্বন্দ্ব—কোনদিক থেকেই উল্লিখিত নাটক দু'টি নাট্যপদবাচ্য নয়। বিশেষ করে সংলাপ রচনার ব্যর্থতায় নাটক দু'টি বিশেষভাবে মার খেয়েছে। এই পর্বে 'যথার্থ নাট্যোপযোগী সংলাপ তখনো নাট্যকারগণ খুঁজে পাননি।'[২]

সেদিক থেকে রামনারায়ণকে সার্থক নাট্যসংলাপের জনক বলে দাবী করা যেতে পারে। একথা ঠিক, রামনারায়ণ প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তিনি নতুনের পথও প্রস্তুত করেছেন। রামনারায়ণ ঐতিহ্যের উত্তরসূরী ঠিকই। তাই সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণে তিনি শিষ্টজনের মুখে সাধুভাষা এবং প্রাকৃতজন ও স্ত্রীজনের মুখে চলিত ভাষা বা মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন।[৩] এছাড়া তিনি সংস্কৃত কবিতা, ছড়া, প্রবচন যত্রতত্র আমদানি করেছেন। আবার একই নাটকের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই-সব কবিতা ও ছড়া ব্যবহারের অত্যধিক আসক্তি বাহুল্যবোধে বর্জনও করেছেন। সংলাপকেও প্রয়োজনবোধে কাটছাঁট করেছেন—তাকে অনেক পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ

১. The Elements of Drama—J. L.Styan, p. 11-12.

২. বাংলা নাট্যরীতি : বিকাশ ও বৈচিত্র্য—ড. বিষ্ণু বসু, পৃ ২০১।

৩. সংস্কৃত নাটকে সম্ভ্রান্তজনের মুখে সংস্কৃত ভাষা ও স্ত্রীলোক ও সাধারণের মুখে প্রাকৃত ভাষার সংলাপ রীতির চলন ছিল।

ও জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। এসবই রামনারায়ণের সচেতন শিল্পমনস্কতার ফলশ্রুতি। বস্তুত তিনি পথ খুঁজেছেন, পথ প্রস্তুত করেছেন, নতুনের অভ্যুদয়কে সূচিত করেছেন, যা তাঁর আগে আর কেউ করেননি।

রামনারায়ণ বঙ্গনাট্যসাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চের প্রথম ঋত্বিক। তিনিই সর্বপ্রথম সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রক্তমাংসের সজীব চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন এবং সেই চরিত্র নির্মাণ কৌশলে ভাষাই তাঁর প্রধান সহায়। 'চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ এবং সংলাপ অনুযায়ী চরিত্র' নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁরই। ভাষা যে কত সাবলীল, অর্থবহ হয়ে চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে পারে, তার একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। কুলপালকের ভৃত্য ভোলা প্রভুর নির্দেশে পুরোহিতকে খবর দিতে চলেছে। পথে যেতে যেতে তার উক্তি : 'ঐ ওস্তরের বাড়ির মুই খ্যানাকাট্টি গেহালাম, এস্‌তে এস্‌তেই বডমোশাই বল্যো ওরে ভোলা, তুই যা, পুরুঠ্‌ঠাকুরের ডাকি আন', তা এই মুই অদ্দুরে আলাম্, তামুক খাতিও পালাম্ না, তাইতো মোদের বৌ বলেহালো, বলে "চাকুরি না কুকুরি" তা খাতি পত্তি পাইনে না করে কি কর্বো ? মুনিব যা বলে তা না কল্যো মেইনে দেবে কেন ? খ্যাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্ছি, আসি তবে তামুক খাব।'

ভোলার এই উক্তির মধ্যে চরিত্রটির মনস্তত্ত্ব ও হৃদয়ানুভূতির মর্মসত্য অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সে অতি দরিদ্র, সুতরাং দু'মুঠো অন্নের জন্য তার না খেটে উপায় নেই। প্রভুর বিরক্তির ফলে তার চাকরি গেলে তার গত্যন্তর থাকবে না—এটাও সে জানে। তাই প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য তার নিরলস পরিশ্রম —নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন। অন্যদিকে এই দীনতার প্রকৃত অর্থও সে জানে ('চাকুরি না কুকুরি')। দাম্পত্য-জীবনে তার শান্তি ও তৃপ্তির ব্যঞ্জনাও সংলাপটিতে আভাসিত। সর্বোপরি, ভোলার সূক্ষ্ম কৌতুকবোধ এবং ব্যবচ্ছিন্নতা বোধও (sense of detachment) সবিশেষ লক্ষণীয়। সংলাপের সামান্য কয়েকটি আঁচড়েই রামনারায়ণ চরিত্রটিকে আশ্চর্য জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন।

সংলাপের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, এর মাধ্যমে চরিত্র বিশিষ্টতা অর্জন করে। বস্তুত, সংলাপের মাধ্যমে একটি চরিত্রকে আমরা স্বমহিমায় চিনে নিতে পারি। পূর্বকথিত 'সংলাপ অনুযায়ী চরিত্র, চরিত্রানুযায়ী সংলাপ' সূত্রটির সার্থকতা এখানেই। রামনারায়ণের আলোচ্য নাটকে সংলাপের মাধ্যমে চরিত্র-সৃষ্টির এই নৈপুণ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি। আর এখানেই তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত। দৃষ্টান্ত দ্বারা একথার যাথার্থ্য প্রমাণ করা যেতে পারে।

উদরপরায়ণ কুলপালকের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত। সুমতি তার শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় এসে স্বামীর খোঁজ করছে সংবাদটি তাকে দেওয়ার জন্য। উদরপরায়ণের আবির্ভাবের পর শিশু ও সুমতির সঙ্গে তার কথোপকথনের অংশ—

শিশু। ওমা ২, এই যে বাবা এয়েছে, আমি বাবার সঙ্গে যাব।

উদর। কিরে তুই এখানে কেন? একা এসেছিস্ নাকি?

শিশু। (শীঘ্র গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধারণ পূর্ব্বক) এই যে বাবা এয়েছে ২, ও বাবা ২ আমি মার সঙ্গে এইচি, ঐ মা দাঁড়িয়ে আছে (হস্তদ্বারা দর্শায়)।

উদর। (সুমতির প্রতি সক্রোধে) কি! এমন্ যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর! লজ্জা নাই! ভাদ্রমাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না? এই চারিদিগে পুরুষ এখানে আসা, দেকবি একবার?

শিশু। বাবা, মা তোকে ডাকতে এয়েচে।

উদর। আমারে ডাকতে এসেছে কি আর কাকে ডাকতে এসেছে, তার নিশ্চয় কি?

সুমতি। (সভয়ে) ফলারের কথা বল্‌তে এসেচি।

উদর। (সানন্দে) আঁ, কি বল্যি! নিকটে যায় ২, এখানে কেহই নাই, এতো লজ্জাই কি? ভাল তুইতো আর নবধ্বাগমনের বৌ নোস্, (সুমতিকে নিকটে আনিয়া) কি বল দেখি, ফলার জুটেছে, বলিস্ কি নিমন্ত্রণ না অনিমন্ত্রণ?

সুমতি। অনিমন্ত্রন আবার কি?

উদর। তুই মেয়েমানুষ কি বুঝবি? নিমন্ত্রণ অপেক্ষা অনিমন্ত্রণে অধিক মজা, নিমন্ত্রণে পেটে খাওয়া যায়, কিন্তু অনিমন্ত্রণে পেটে পিটে দুইয়েতেই হয়।

উদ্ধৃত অংশে তিনটি চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য স্পষ্টই ধরা পড়েছে। উদরপরায়ণ উদরসর্বস্ব, স্বার্থপর প্রকৃতির। স্ত্রীকে সে খেতে দিতে না পারুক, কর্তৃত্বাভিমান নিয়ে শাসনের নামে নির্যাতনে যথেষ্ট পটু। যেমন নিজের নেই তেমনি স্ত্রীকেও সে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত নয়। নানা ছলছুতোয় সে তাকে মারধর পর্যন্ত করে। স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে অভব্য ইঙ্গিত করতেও সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। আবার স্বার্থের গন্ধ পেলে স্ত্রীর দোষ (?)-ও তার কাছে গুণের হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সুমতির মনে অপদার্থ স্বামী সম্পর্কে যতই বিরক্তি থাক, স্বামীকে সে ভয় পায়। সে জানে এই নরপশু তাকে প্রকাশ্য

রাজপথে সন্তানের সামনে নির্যাতন করতেও দ্বিধা করবে না। শিশু সরলপ্রাণ। নিমন্ত্রণের কথায় সেও উৎসুক। বস্তুত এই তিনটি চরিত্রকে ঘিরে যে নাট্যদ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে, তা নিশ্চিতই হাস্য-করুণ রসসিক্ত জীবনের প্রতিফলন। তিনটি চরিত্রের ভিন্নমুখী মনোভঙ্গির টানাপোড়েনে নাট্যদ্বন্দ্ব উজ্জ্বল ও সঞ্জীবিত হয়েছে। এরপর দেখা যায়, সুমতি উদরপরায়ণকে অনুরোধ করছে—শিশুপুত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ—'ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও, খেয়ে আসবে।' এর উত্তরে সুমতি পায় তিরস্কার, আর শিশু পায় চপেটাঘাত। শেষে নিকণ্টক উদরপরায়ণের উক্তি--'যাক্ উৎপাত গেল, এখন আমি যাই।' —এক স্বার্থপর মনুষ্যকাটের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বস্তুত রামনারায়ণ প্রতিটি চরিত্রের মুখে প্রয়োজনীয় সংলাপটুকুই জুগিয়েছেন। তাঁর ভাবগর্ভ বা শ্লেষাত্মক সংলাপ—যাই হোক না কেন, তার নেপথ্যে এই মনোভাবই সক্রিয় থেকেছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'রামনারায়ণের নাটকের সংলাপ যা বলবার, তাই শুধু বলেছে। এ-সংলাপ তির্যক, অর্থবহ ও চরিত্রের উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসী। এ-সংলাপ নাটককে এলিয়ে দেয়নি, এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একে Patterned language বলা যায় না।'[১]

সমাজ-চেতনা

সমাজ-সমস্যা সম্পর্কে প্রখর চেতনা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা, গভীর জীবন-বোধ ও সহানুভূতি নিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্য-জগতে রামনারায়ণের আবির্ভাব। বস্তুতঃ রামনারায়ণ সর্বপ্রথম জীবনভিত্তিক নাটক রচনা করে সমাজের এক দুষ্টক্ষতের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।[২] সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক মনোভাব নিয়েই তাঁর নাট্যরচনার সূত্রপাত। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, উদ্দেশ্যের সঙ্গে অন্তরের তাগিদও তিনি অনুভব করেছেন। যে সমাজচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন,

১. বাংলা নাটকের বিবর্তন—ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ ২৭৭।

২. 'যে নাটকখানি রচিত হইয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যকে একটি বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক, তাহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক। বাংলার সামাজিক জীবন যখন পর্যন্তও কাব্য, কথা সাহিত্য কিংবা অন্য সাহিত্যরূপের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তখনই তাহা নাটকের বিষয়রূপে গৃহীত হইয়া সে যুগের একখানি সার্থক সাহিত্যকীর্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, এই সামাজিক নাটকখানিই বাংলার সর্বপ্রথম অভিনীত মৌলিক নাটক।' বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ ৩০-৩১।

তার তথ্যমূলক অভিজ্ঞান (documentary evidence) রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রসমূল্যও অস্বীকার করা যায় না। তাই এই নাটকের আবেদন সেকালকে অতিক্রম করে একালের রসিকজনের দরবারেও এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সে অন্যকথা। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের সমাজচিত্রটি অনুধাবন করতে চেষ্টা করব।

সে ছিল এক অত্যাশ্চর্য কাল। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথার নারকীয় তাণ্ডবে তখন বাংলাদেশে এক ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছিল। বল্লাল প্রবর্তিত কুলপ্রথার নবধা রূপ—'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তিঃ তপোদানং নবধাকুললক্ষণম্ ॥" কিন্তু কালক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কুলীনপুত্রেরা অন্যসমস্ত গুণ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র বিয়ে করাকেই একমাত্র কুলীন-ধর্ম বলে মনে করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ সেনের আমলে কৌলীন্যপ্রথা বংশগত হয়ে দাঁড়ালো। ফলে কুলীনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে অনেকে বংশ ও সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধির চেষ্টায় ব্রতী হলেন। অনেকে আবার বিবাহকে পেশা হিসাবে নিল। একই কুলীন পাত্রের বহু বিবাহ কিম্বা কুলীন পাত্রের অভাবে বিবাহ না ঘটা, বিবাহিতা কন্যার পিত্রালয়ে থাকা, নানা প্রকার ব্যভিচার ইত্যাদি ব্যাপার সমাজে প্রত্যক্ষীভূত হতে থাকল।[১]

রামনারায়ণ তাঁর নাটকে বহুবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি যে সব তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত করেছেন, তার কোনটাই কাল্পনিক নয়—বস্তুত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' সেকালের সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিলরূপে গণ্য হতে পারে।

কুলীন সমাজে বহুবিবাহ প্রথা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, এক একজন কুলীন পাত্র অর্থলোভে বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করত। এটাই তাদের জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভঙ্গজ হওয়ার ভয়ে কুলীন পিতা কোন অকুলীন পাত্রের হাতে কন্যাদান করতে ইচ্ছুক হতেন না। ফলে অন্তর্জলি

১. 'কালক্রমে কুলপ্রথা ব্রাহ্মণসমাজে বিভীষিকার কারণ হয়ে দেখা দিল। পাল্টি ঘর না পেলে কন্যাকে সারাজীবন অবিবাহিত থাকতে হত। নারীসমাজের দুর্নীতি প্রচণ্ডভাবে দেখা দিল। অপদার্থ কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহুবিবাহকেই উপার্জনের সুলভতম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করলেন।'—বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, ড. প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত, পৃ ১২০।

যাত্রারত বৃদ্ধ অথবা দুগ্ধপোষ্য শিশু—যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহদানে তাঁরা পরাঙ্মুখ হতেন না। কুলপালকের চার কন্যা—বিগত-যৌবনা, প্রায়-যৌবনাতিক্রান্ত, কিশোরী, বালিকা—চারজনেরই বিবাহ দেওয়া হল একজন মাদকাসক্ত, রোগগ্রস্ত বৃদ্ধের সঙ্গে। এতো সেকালের সমাজেরই চিত্র।

কুলীনদের অনেকেরই বিবাহ-সংখ্যা গণনাতীত-প্রায় হয়ে দাঁড়াত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বহুবিবাহ' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে কতিপয় কুলীনের নাম, বয়স, বাসস্থান ও বিবাহসংখ্যার পরিচয় দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি ৫৫ বছর বয়সে ৮০টি, অন্যজন ৬৪ বছর বয়সে ৭২টি, আর একজন ৫৫ বছর বয়সে ৬২টি বিবাহ করেছেন। এরূপ উদাহরণ আরো বহু আছে। রামনারায়ণ তাঁর নাটকেও এই বাস্তব অবস্থাকেই চিত্রিত করেছেন। সেখানে অধর্মরুচির উক্তি—'আমি সাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ আর 'বে' করি নাই,—কতগুলো 'বে' কর্লে কি হবে? আমাদ্দাদা মহাশয় চারকুড়ি পোনেরটা 'বে' করেছেন, এখন তিনি অন্তদন্তহীন হয়েছেন তবু পেলে ছাড়েন না।'

এতগুলি স্ত্রীর 'ধর্মরক্ষা' কিভাবে সম্ভব? এর উত্তরে অধর্মশীলের উক্তি—'ধর্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন, আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারিনে, অথবা যার ধর্ম্ম সেই রক্ষা করে, আমাধর্ম্ম এই যে 'আমরা কুলীনের ছেলে, ধর্মে ২ কিছু পেলে ছাড়িনে'। বস্তুত কুলীন মহাত্মারা কিছু উপায়ের সন্ধানেই বিবাহ করে। বিবাহের পর স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, কোনদিন স্ত্রীর তত্ত্ব-তল্লাশ পর্যন্ত করে না। দৈবাৎ কোন কুলীন মহাত্মা শ্বশুরালয়ে হাজির হয় নেহাৎই পয়সার লোভে, সেখানে উপযুক্ত (!) প্রণামী ইত্যাদি না পেলে ক্ষণকালও অবস্থান করে না। ফুলকুমারীর চিত্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।—

শশব্যস্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া।
বাহিরে বসিতে দিল গালিচা পাতিয়া॥
ধনুর্ভঙ্গ পণ কহে সবা বিদ্যমানে।
'ব্যাভার পাইলে তবে পা ধোবো এখানে'॥
শুনিয়া জননী মোর বড়ই দুঃখিনী।
খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু আনিল আপনি॥
টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তাকে দিল।
এমনি কুলের ধর্ম তবে পা ধুয়িল॥

কিন্তু এত অল্প পেয়ে জামাতা-বাবাজী তুষ্ট নন। শয়নঘরেও তিনি পত্নীকে

অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। পত্নী কাটনাকাটা পয়সা-কড়ি সব দিয়ে স্বামীর মনস্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রোধে অন্ধ পতিদেবতা ক্রোধভরে শয়ন ঘর ত্যাগ করে টোলে গিয়ে শুয়ে পড়ল—আর এদিকে ফুলমণি 'একাকিনী বিরহিনী যামিনী জাগিয়া।/ নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥' ফুলমণির এই ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, তখনকার কালে কুলীন সমাজে এটাই ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ' গ্রন্থের একটি উক্তি—'কোনও অতিপ্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর দিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেইখানেই যাই— ।'[১]

কুলীন সমাজে কৌলীন্যপ্রথা বজায় রাখার জন্য যত ব্যস্ততা ছিল। কিন্তু চোরাবালির সুড়ঙ্গ দিয়ে যে ব্যভিচারের স্রোত অহরহ ঢুকে পড়ত—এদিকে সমাজপতিদের দৃষ্টি ছিল না বা দৃষ্টি থাকলেও উপায় কিছু ছিল না। স্বামীত্যক্তা কুলীন বনিতার যৌবনের তাড়নায় পরপুরুষ ভজনা করার প্রতিক্রিয়া সামাল দেবার জন্য তখন মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন ব্যস্ত হয়ে পড়ত। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন 'বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই, তথাপি কোনও ভঙ্গ-কুলীনের ভার্য্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন।…তাহার হিতৈষী আত্মীয়, এই সর্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় করিতে না পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।' আলোচ্য নাটকেও সেরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে—মহিলা ও মাধবীর কথোপকথনে। মহিলা নাম্নী রমণী মাধবীকে বুঝায়—'অমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাব? তুইও আমার মতে আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেছিস্?…তোর ভাই যেমন্ কথা,—

১. 'অতএব কুলীন পাত্রেরদের প্রতি এমত অনুরাগপ্রযুক্ত ঐ কুলীনেরা নিষ্কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করাতে স্বীয় স্বীয় মর্য্যাদা প্রদানের অনেক মূল্য লইতে লাগিলেন। এবং ব্রাহ্মণাদির ব্যবস্থানুসারে অনেক বিবাহ করা যায় এই প্রযুক্ত তাঁহারা কেহ ১০ বা ২০ বা ৩০ বা ৪০ বা ৫০ বিবাহ করেন এবং তাবদ্দেশ ভ্রমণ করতঃ যে স্থানে কন্যা গ্রহণ করাতে অধিক টাকা প্রাপ্ত হন সেই স্থানে তাদৃশ বংশে বিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই বিবাহিতা স্ত্রী সকল নিত্য স্বীয় ২ পিতৃগৃহে থাকে স্বামী কেবল কখন ২ তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকবারে সাক্ষাৎ করাতেই টাকা দাওয়া করেন।'

সমাচার দর্পণ, ৪ ডিসেম্বর, ১৮৩০।

'পরপুরুষ আপন পুরুষ' কি লো ? পুরুষ হলেই হয় আমি যা বুঝি।' কিন্তু লোক জানাজানি হলে বা গর্ভবতী হলে কি উপায় হবে ? এর উত্তরে মহিলা বলে— 'বিভ্রাট কি ?' 'তা হয় অপূর্ব একটী মুখুয্যা হবে'। মহিলা আরো বলে— 'কুলীনের মেয়ে গঙ্গাজল ধুয়ে খায় এমন কে আছে ?' মা-বাপ সম্পর্কে উক্তি— 'তারা কি জানেন না ? যখন কুলীনকে দেন তখনি জেনে থাকেন।' বস্তুত কুলীনকন্যার অনন্যোপায় হয়ে এই ব্যভিচার তখন সমাজকে মেনে নিতে হত—শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত হয় ভ্রূণহত্যা করে, অথবা জামাতা বাবাজীকে অর্থলোভে বশীভূত করে তার দ্বারা সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করিয়ে নিয়ে।

অনেকসময় ভিন্ন উপায়ও গ্রহণ করা হত। কন্যা গর্ভবতী হলে পাড়ায় রটিয়ে দেওয়া হত—অমুক রাতে জামাতা অল্পসময়ের জন্য শ্বশুরালয়ে আগমন করেছিল, সময়াভাবে চলে গেছে। সুতরাং পিতার অজ্ঞাতসারেই কুলীন-সন্তান ভূমিষ্ঠ হল এবং বড়ো হতে থাকল। বহুবছর বাদে আকস্মিকভাবে হয়তো পিতাপুত্রে সাক্ষাৎকার ঘটল। ঈশ্বর গুপ্ত এরূপ একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন —'এরূপ প্রবাদ আছে যে কোন এক কুলীন মহাশয় একেবারে তাঁহার সন্তানের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া মহাবিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন যে, ওরে বাপু, কেন এত খীদ্যমান হইয়াছ ? আমি তোমার উপনয়ন কালে জানিতে পারিয়াছিলাম।' বস্তুত এরূপ চিত্রই অধর্মরুচি ও বিবাহবণিক পর্বে এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। তিন বছর যে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই, সেই স্ত্রীর সন্তানের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে যাওয়ার চিঠি পেয়ে অধর্মরুচিকে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হতে দেখে তার পিতা বিবাহবণিক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—'(উচ্চহাস্য করিয়া) বাপুহে, তাতে ক্ষতি কি ? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ! তা বাপু আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি ? যাও বাপু, তারা আমোদ করে লিখেছে, যাও, লজ্জা কি ?' বিবাহবণিকের নিজের জীবনের আর একটি দৃষ্টান্তও নাট্যকার এখানে তুলে ধরেছেন। উত্তম পিতা বিবাহবণিককে দেখে আনন্দিত—'আমি আজি কৃতার্থ হইলাম—জন্মাবধি পিতৃদর্শন পাই নাই।' উত্তমের মুখে একথা শুনে বিবাহবণিকের স্বগতোক্তি—'(স্বগত) তুমি দর্শন পাবে কি তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই—সেই শুভদৃষ্টি মাত্রই যা হউক। কৈ, অধর্মরুচি বাবা এখন কোথায়,

—কন্যা হয়েছে বলে বড় ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন্ এসে, আমার এককালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে !'

এই পর্বে নাট্যকার আর একটি চিত্রও তুলে ধরেছেন। কুলীন মহাশয় বিভিন্ন স্থানে অজস্র বিবাহ করতেন। পত্নীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকত না—থাকা সম্ভবও ছিল না, ফলে অনেক সময় দেখা গেল—স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কোন স্ত্রী পেল, কোনজন পেল না। অনেক সময় মৃত্যুর গুজব শুনেও স্ত্রী বৈধব্যবেশ ধারণ করত। বিবাহবণিকের মাধ্যমে নাট্যকার সেই চিত্রটি তুলে ধরেছেন। উত্তম বিবাহবণিককে জানায়—'আজি তিন বৎসর হইল আমি মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম,...কিন্তু তাহাতেই আমার মাতাঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন।...তাই মহাশয়কে এতো আকিঞ্চন করিয়া যাইতেছি,—তাহারাও (আত্মীয়-পরিজন) তুষ্ট হইবেন, মাতাঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে।'

'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে কুলীনের বহুবিবাহ প্রথাকে নাট্যকার তীব্র শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত করেছেন সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে সমাজের অন্যশ্রেণীর বিবাহপ্রথার প্রতিও উদাসীন ছিলেন না। যেমন, বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের কন্যাবিক্রয় প্রথাকেও তিনি নিষ্ঠুর আঘাত করেছেন—দুটি চিত্রের মাধ্যমে।[১] প্রথম, গর্ভবতী চিত্র। সন্তান-সম্ভবা গর্ভবতী এসে পুরোহিত ধর্মশীলের পায়ে পড়েছে—এমন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন তিনি করে দিন, যাতে 'এবার যেন আমার এট্টী মেয়ে হয়।' ইতোপূর্বে বহুপুত্র প্রসব করাতে সে স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিতা। কারণ সে বংশে সকলে মেয়ে বেচে—'আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড ভাসুর

১. '—কুলীন ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণেরদের বিবাহ করিতে অনেক টাকা দিতে হয় এবং ঐ বিবাহ করণেতে তাঁহারদের তিন চারি পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত কর্জ্জ করিবার আবশ্যক হওয়াতে তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ কর্জ্জের সুদসাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।'

সমাচার দর্পণ, ৪ ডিসেম্বর, ১৮৩০।

'—কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত গোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ হওয়া অতিদুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতু অর্থব্যয় ভিন্ন তৎকর্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না সুতরাং যাহারা গোত্রহীন তাঁহারদিগের বিবাহ হওয়া ভার কতশত গোত্রহীন শ্রোত্রীয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এই ক্ষণেও ৩০।৪০।৫০ পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসরবয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপ শোকে জরজর থরথর এবং মরমর হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারদিগের এ কাটামোতে আইবড নাম ঘুচে কিনা বলা যায় না।'

সমাচার দর্পণ, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১।

পাঁচ্‌টা মেয়ে বেচে কোটা করেছেন, আরো এখনো ছুটো আছে। আমার চারিটাই ছেলে, মেয়ে হয়নি তাই আমাদের সেই মিনষে আমারে সর্ব্বদা তাড়না করে বলে 'এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে'! এবার আবার সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজি কোথা থেকে এসেই আমাকে নিগ্রহ কল্যে, আর বল্যে 'এবার যদি না মেয়ে হয় দূর করে দেবো'।' বিরহি-পঞ্চানন ও বিবাহবাতুল পর্বে এই কন্যাবিক্রয় প্রথার অন্যদিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বিরহিপঞ্চানন স্ত্রীবিয়োগে কাতর, পণ দিয়ে সে বিবাহ করেছিল, কিন্তু এখন তার হা-হুতাশই সার—'আর ভাই প্রজাপতির গন্ধে কায নাই, ঐ গন্ধেই অন্ধ হইয়া সর্বস্ব বিক্রয় পূর্বক সেই বিবাহবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি।' আর বিবাহবাতুল বিবাহের জন্য উন্মাদ, অথচ তার এখনও বিবাহ হল না—'আমার যে একবারও হইল না।' তাই সে ভাবে—

এবার মরিয়া আমি হইব বৈদিক।
মারিব বল্লালে ঝাঁটা ভাবিয়াছি ঠিক॥
কাণা খোঁড়া আতুর বা হই যদি অন্ধ।
তবু গর্ভেগর্ভে মোর হইবে সম্বন্ধ॥
পেটে থেকে পড়িয়া করিব গিয়ে বিয়া।
সংসারের সুখ হবে গৃহিণীকে নিয়া॥
থাড়ুনাড়া ব্যঞ্জনের কতো বা আস্বাদ।
দেখিতে হইবে ভাই মনে বড় সাদ॥

এ নাটকে সেকালের সম্পূর্ণ খাদ্যতালিকা না পাই, তিনপ্রকার ফলারের নিখুঁত বর্ণনা পাই। উদরপরায়ণ আক্ষেপ করে বলেছে—'পূবমত ফলার নয়নে দেখি নাই।' তার মতে—

উত্তম ফলার

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি   দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাকভাজা   মতিচুর বঁদে খাজা
ফলারের জোগাড় বড়ই॥
নিখুঁতি জিলাপি গজা   ছানাবড়া বড় মজা
শুনে সক্‌সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা   যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা

যত খাই তত হয় তোলা ॥
খুরি খুরি ক্ষীর তায় চাহিলে অধিক পায়
কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বাম হাতে দক্ষিণা পানের সাতে
উত্তম ফলার তাকে কই ॥

মধ্যম ফলার।

সরু চিড়ে শুকো দই মর্ত্তমান ফাকা খই
খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয় ॥

অধম ফলার

গুমো চিড়ে জলো দই তিত গুড় ধেনো খই
পেটভরা যদি নাহি হয়।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে হাত দিয়ে পাত চাটে
অধম ফলার তাকে কয় ॥

এই নাটকে রামনারায়ণ ঘটকের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে আলো ও অন্ধকার দুই-ই আছে। শুভাচার্য সৎপথে ঘটকালি করে—তার বিলক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞানও আছে। কিন্তু ঘটক অমৃতাচার্য শাস্ত্রজ্ঞানহীন, মিথ্যাবাদী, কর্কশভাষী—যেনতেন প্রকারে একটি বিবাহ দিতে পারলেই হয়, তাতে সে পাওনা-গণ্ডা পাবে, এই তার মনোভাব। সুধীর তার সম্পর্কে বলেছে—

আসিল পরের জাতি কুল নাশ হেতু।
বিবাহ নির্বাহ বিধি জলধির সেতু ॥
অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধর্মকর্মা।
চুড়ামণি মিথ্যাবাদী অমৃতাচার্য শর্মা ॥

স্বার্থপর এই ঘটকের ন্যায়-নীতি বা ধর্মবোধ বিন্দুমাত্র নেই, নেই অপমান জ্ঞানও। নির্লজ্জ এই ব্যক্তি নিজ মুখেই স্বীকার করে—'আমি সাবর্ণগৃহে কতশত কৈবর্ত্ত-কন্যা চালাএছি, শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবর্তীর সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটাএছি; আর কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, সমস্ত তো আমার চরিত্রের আভরণ। এই ১৪ই মাঘে খড়ীবাটীর রুচিরাম চক্রবর্তীর কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের

কিঞ্চিদ্দক্ষিণা পাইয়া মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ চাতুর্য্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখনও অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখাও।' বস্তুত অমৃতাচার্যের এই উক্তিতে দু'টি বিষয় বোঝা যায়—এক, ঘটকের নির্লজ্জতা, দুই, সে-যুগে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মিলন।

বিবাহস্থলে দুই পুরোহিতের ঝগড়ার দৃশ্য আছে। কুলপালক তার কন্যাদের বিবাহে পৌরোহিত্য করবার জন্য ধর্মশীল নামে বিজ্ঞ, ধার্মিক পুরোহিতকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে সভায় অভব্যচন্দ্র নামে একজন রবাহুত পুরোহিতও হাজির। সে আমন্ত্রিত নয়, কুলপালকের নামও সে জানে না, সে-ও কুলপালকের পরিচিত নয়—অথচ সে নিজেকে কুলপালকের পুরোহিত বলে দাবী করে, কারণ 'মাতামহ সম্পর্কে আমি পুরোহিত···আমার মাতামহ ঠাকুর সেই গ্রাম দিয়া গঙ্গাস্নানে যেতেন, যে গ্রামে কুলপালক বে করে।' নাট্যকার নিছক রঙ্গ-রস সৃষ্টির জন্য এ-দৃশ্য সংযোজিত করেননি। বিবাহসভায় একাধিক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি হাজির হয়ে পৌরোহিত্যের দাবী জানাত, এবং গৃহস্বামীকে প্রয়োজন হলে যথাসর্বস্ব বিক্রয় করেও আমন্ত্রিত, রবাহূত সব পুরোহিতের ও ঘটকের দক্ষিণা মেটাতে হত—এমন ঘটনা সে-যুগে ঘটতে দেখা গেছে।[১]

হাস্যরস

'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকটি প্রহসনধর্মী নাটক হলেও একে যথার্থভাবে প্রহসন বলা যায় না। এর বিন্যাসরীতি হাস্যরসাত্মক—সে হাসি কখনো শ্লেষাত্মক, কখনো অম্ল-মধুর রঙ্গ-ব্যঙ্গের। কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে যে করুণ-রসের অবিরল স্রোতধারা প্রবহমান—নাট্যকারের ঈপ্সিত ইঙ্গিত সেদিকে, এটা অনুমান করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তু নিয়ে নাট্যকার সচেতনভাবে নাটক রচনা করতে গিয়ে নিছক ভাঁড়ামো

১. 'কিন্তু যখন ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহোপস্থিত হয় তৎকালে যদি উক্ত ঘটকেরা ঐ বিবাহের সম্বাদ জানিতে পারেন তবে বিবাহের নিমিত্ত তাঁহারা আপন ২ দলবল সমভিব্যাহারে উক্ত কন্যাকর্ত্তার বাটীতে আসিয়া উপনীত হন এবং যত ঘটক ঐ রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হন সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থদান দ্বারা কন্যাকর্ত্তার অতিকর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় অর্থাৎ কন্যাকর্ত্তা আপন ২ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক রাখিয়াও ধামগত ঘটক ইত্যাদিকে যথাসাধ্য তুষ্ট করিয়া থাকেন এরূপে অনেকের ধনক্ষয় হইয়াছে এবং হইতেছে।'

সমাচার দর্পণ, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১।

করতে বসেননি। বরং শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ণ শায়কে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন জগত ও জীবনের তথা সমাজের এক নিদারুণ অসঙ্গতিকে। কিন্তু শ্লেষের (Satire) বৈশিষ্ট্যই এই যে, সেই শায়ক উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করে রক্ত ঝরালেও সাধারণের কাছে তা হয়ে ওঠে নিছক হাসির উপাদান। সেই হিসাবে, এ নাটকে অজস্র হাসির উপাদান রয়েছে। বরং বলা যায়, জীবনরসিক 'নাটুকে' রামনারায়ণ হাসির আবরণে একদিকে সমাজের এক দুষ্টক্ষতকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, অন্যদিকে জীবন ও জগতের প্রতি অপরিমেয় মমতায় নীরবে চোখের জল ফেলেছেন।

আলোচ্য নাটকে অজস্র হাসির উপাদান রয়েছে। এই উপাদানগুলি কখনো নিছক রঙ্গ-ব্যঙ্গের, কখনো বা হিউমারের, কখনো বা স্যাটায়ারের। 'টুলো পণ্ডিত' রামনারায়ণ যে একজন নিপুণ হাস্যরস-স্রষ্টা ছিলেন—এ নাটকের ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ রয়েছে। গুরুগম্ভীর ভাবকে হাসির মোড়কে পরিবেশন করে রামনারায়ণ এক আশ্চর্য রচনাশৈলীর নিদর্শন রেখেছেন। তিনি আলোচ্য নাটকের বিজ্ঞাপনে যথার্থই বলেছেন—'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিযাছে, তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পাবে।' 'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে'—নাট্যকারের এই প্রথম উক্তি আক্ষরিকভাবেই সত্য। দ্বিতীয়াংশও সর্বাংশে সত্য, তবে তার আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। প্রথম অঙ্কে কুলপালক ও কুলধনের কথোপকথনের মধ্যে প্রচুর হাস্যরসের অবকাশ আছে। কুলপালক তাঁর তিন কন্যার বিবাহ দেওয়ার জন্য কুলীন পাত্র খুঁজে হয়রান। ত্যক্ত-বিরক্ত কুলপালকের খেদোক্তি—'বলি, ভাই তোমার দেশের খুরে দণ্ডবৎ, এমন্ দেশ কোথাও দেখি নাই।' কুলধন এই কথার ভিন্ন তাৎপর্য গ্রহণ করে বলে—'যথার্থ ভাই, এদেশে খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না; হাট নাই, বাজার নাই, তরকারির মধ্যে পুঁইশাগ, গব্যের মধ্যে তেঁতুল, দেশে থাকাই দুঃসাধ্য।' কুলধনের এই উল্টোপাল্টা উক্তি নিঃসন্দেহে কৌতুকের বিষয়। কুলপালক দেশাচারের উল্লেখ করলে কুলধনের উক্তি—'হ্যাঃ রেখে দেও তুমি দেশের কথা, এদেশে কেবল দ্বেষ বৈ নেই'—উইট-সমৃদ্ধ। নিজের মেয়ের বয়সের হিসাব প্রসঙ্গে কুলধনের বক্তব্য—'বয়েস বড় অধিক নয়, সেদিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি মেয়েটার বয়েস কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না. ঠিকুজিখানা জীর্ণ হয়েছে, আঁকর বোঝা

যায় না, তা নাই গেলো, সে এই বড পিসীর বইসী।' এই উক্তির মধ্যে শ্লেষের সুর ব্যঞ্জিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে অনৃতাচার্য-পর্ব হাস্যরসসমৃদ্ধ। অনৃতাচার্যের বাগাড়ম্বর, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচারণ ও পণ্ডিতম্মন্যতা হাসির উদ্রেক করে। বস্তুত তার সংলাপ ও আচরণে অসংগতিই কৌতুকের বিষয়। অনৃতাচার্য নিজেকে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ঘটকচূড়ামণি বলে জাহির করে, অন্যের বংশ-পরিচয় নির্দেশ করতে সে কল্পনার জাল বুনে তাকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, অথচ নিজের পিতৃনাম তার স্মরণে নেই—এই কৌতুক যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে। 'আমি কি জানি না পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ইহা ছাড়া বামণ নাই। আমার অবিদিত কোন্ ঘর্ আছে?'—অনৃতাচার্যের এই দম্ভোক্তির পর শুভাচার্যের সঙ্গে তার কথোপকথন—

শুভ। আপনকার পিতৃঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

অনৃ। আঁ, কি বল্যো হে? কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড গ্রীষ্ম।

শুভ। মহাশয়ের পিতার নাম কি?

অনৃ। বড় মশা।

শুভ। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপান কার পুত্র?

অনৃ। অধিকদিন হইল আমার পিতৃঠাকুরের পরলোক হইয়াছে।

শুভ। (সহাস্য মুখে) আমি পরলোক ও ইহলোকের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন?

অনৃ। বিলম্ব কর, অধিক দিন তাঁহার কাল হইয়াছে, নাম প্রায় এক প্রকার বিস্মৃত হওয়া গিয়াছে, স্মরণ করি তবে তো বলিব, তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে?

শুভ। কে আছ হে—শুনিলে? ইনি এমনি ঘটক নিজ পিতৃ নামও বিস্মৃত হন। কিন্তু অন্যের পিতৃ-পিতামহের নাম ইঁহার মুখাগ্রবর্ত্তি, সে সময়ে একটাও ঠেকেনা!

অনৃ। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি? যাহা আইসে একটা বলিলেই হয়।…

অনৃতাচার্য ঘটকের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছে, তাতে তার মূর্খতা অথচ দাম্ভিকতার মধ্যে দিয়ে তীব্র শ্লেষের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর উক্তি—'বেল্লিক পুরাণে মাতলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপু হে, এ সকল কথা

জানতে হয়, এ সকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় না। আমি এ সকল শিখিয়া ও এ সকল গুণে ভূষিত হইয়াই 'ঘটক চূড়ামণি' নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ গৃহে কতশত কৈবর্ত্ত কন্যা চালাএছি, শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবর্ত্তির সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটাএছি, আর কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, সমস্ত তো আমার শরীরের আভরণ। এই ১৪ই মাঘে খড়াবাটীর রুচিরাম চক্রবর্ত্তির কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার একপ অপরূপ চাতুর্য্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখনও অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখাও।'—এই বাগ্‌জালের অন্তরালে তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপের সুরটি চাপা থাকে না।

কুলপালককে পাত্রের পরিচয় দান প্রসঙ্গে অনৃতাচার্যের উক্তি—'বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিকা, আর এমন অধিক বয়সই বা কি? সেই ষষ্ঠীর বৎস এই ষষ্ঠীবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যাহা হউক, তোমার কি অদৃষ্ট, শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে। অতএব তুমি সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কুলীন-মহারথি-কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও।' এখানে শব্দের খেলা, উইট ও স্যাটায়ারের যুগ্ম উপস্থিতি লক্ষণীয়।

গ্রহাচার্য-অনৃতাচার্য পর্বের হাস্যরসটুকুও সবিশেষ উপভোগ্য। গ্রহাচার্যের অজ্ঞতা প্রমাণ করে স্বকার্যসাধনের জন্য কুলপালকের নিকট কথাপ্রসঙ্গে অনৃতাচার্যের উক্তি—'আর আপনিই বিবেচনা করুন্ যদি কল্য উত্তম দিন না হইত তাহা হইলে এতদ্দেশীয় রাজা অমরনাথ বাহাদুর নিজ পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেন না'—কৌতুকপ্রদ।

অনৃতাচার্য একদিনের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করতে বললে কুলপালক দ্বিধাগ্রস্ত হন। কারণ বিবাহের এবং বরযাত্রদের জন্য অন্তত ভোজের আয়োজন করতে হবে। তাতে অনৃতাচার্যের যুক্তি—'অবশ্য হইবে, বরযাত্র আমি, কন্যাযাত্র তুমি, আর পৌরোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম তাহা আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে।' তার উত্তরে কুলপালকের জিজ্ঞাসা—'তবে নাপিতের কর্মও কি আপনি করিবেন?' এখানে শ্লেষের তীব্রতা স্পষ্টই ব্যঞ্জিত।

তৃতীয় অঙ্কে রসিকা ও দেবলের কথার লড়াইয়ে বুদ্ধিনিপুণ বাক্‌চাতুর্যের মাধ্যমে কৌতুকরসের ধারা প্রবাহিত। রসিকার স্বগতোক্তিতে শ্লেষের মাধ্যমে

তার চারিত্রিক ক্লিন্নতার চিত্রটি কৌতুকাবহরূপে উদ্ভাসিত। পরবর্তী পর্বে কামিনীগণের রহস্যালাপ আমোদজনক। 'আর ভাই 'ঘটা', কুলীনের মেয়ের বে' ঘটাই ভার, আবার 'ঘটা' পাবো কোথা বোন? তবে তোরা এসেছিস্ এই ঘটাই 'ঘটা।' ব্রাহ্মণীর এরূপ উইট-সমৃদ্ধ উক্তিও কৌতুকপ্রদ। ফুলকুমারী ও যশোদার কথোপকথনে বিষাদের মধ্যেও কৌতুকের বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে।

চতুর্থ অঙ্কে ভোলার স্বগত উক্তি বাস্তবরসে সমুজ্জ্বল এবং হাস্যোদ্দীপক। ধর্মশীল-অধর্মরুচি পর্বে হাস্যরসের যথেষ্ট উপাদান আছে। এদের কথোপকথনের একাংশ উদ্ধৃত করি—

অধর্ম। কে হে তুমি 'বে' তে আলিস্যির কথা বলচো? বে কর্তে কি আলিস্যি হয়? গেলেম্—বে কল্লেম্—যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম্—আর কি? 'বে অরুচির কাঁচ, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্যি আছে?'

ধর্ম। (জনান্তিক) তর্কবাগীশ, এই দেখ এক মহাপুরুষ! (প্রকাশ্যে) না তাহা নয়, আমি একটি কথার কথা কহিতে ছিলাম্।—আপনার নিবাস কোথা মহাশয়?

অধর্ম। শ্বশুরবাড়ি।

ধর্ম। শ্বশুরবাটী নিবাস ইহা কেমন কহিলেন?

অধর্ম। যেখানে থাকতে হয় সেই নিবাস।

ধর্ম। আপনি কি ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন্?

অধর্ম। (সক্রোধে) আঃ আমি কি ডোম, যে ধর্মশাস্ত্র শিখে ধর্মপণ্ডিত হব?

ধর্ম। আপনি ক্রোধ করিবেন না. জিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে—লোকে করে থাকে তায় ক্ষতি কি? বলুন্ না কেন কি ব্যবসায় করেন্?

অধর্ম। আমার বিবাহ ব্যবসা আর কি ব্যবসা?

ধর্ম। বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহযাত্রা নিবাহ হয়?

অধর্ম। হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন তার খাজাগুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা "রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই" আপনি কি কুলীনেচ্ছেলের বিষয় জানেন না?—ইত্যাদি।

উপরের অংশে জীবনাভিজ্ঞতার এক অপরূপ প্রকাশ। কুলীন-পুত্রের অশিক্ষা, অধোগতি, বিবাহ-জীবিকা অবলম্বনে তার জীবন-নির্বাহের রীতি—সমকালীন

জীবনের এক পক্ক বিস্ফোটকের চিত্র তুলে ধরে। এই অসংগতি ও ক্লিন্নতার চিত্র শ্লেষের সুরে তুলে ধরা হয়েছে এবং তা যথেষ্ট উপভোগ্যও হয়েছে সন্দেহ নাই। বিবাহবণিক ও অধর্মরুচি পর্বেরও উল্লেখ করতে হয়। এ পর্বে বিবাহিতা কুলীন-কন্যা যৌবনের তাড়নায় ব্যভিচারে মত্ত হয় এবং তার আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়াই বা সমাজ কিভাবে চাপা দেয়, তার উজ্জ্বল চিত্র তীব্র শ্লেষের সুরে বিবৃত হয়েছে। উত্তমের সঙ্গে আলাপচারিতায় বিবাহবণিকের স্বগত উক্তি—'তুমি দর্শন পাবে কি, তোমার মাও আমাকে কথন দেখে নাই—সেই শুভদৃষ্টি মাত্রই যা হইক। কৈ, অধর্মরুচি বাপা এখন কোথায়,—কন্যা হয়েছে বলে বড় ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন এসে, আমার এককালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে।'—এতে স্থূলতার ইঙ্গিত থাকলেও হাস্যোদ্দীপকও বটে। নিজেকে নিয়ে যে পরিহাস করতে পারে, তার পরিহাস-প্রিয়তার (Sense of humour) শক্তি স্বীকার করতেই হয়। সেই পরিহাস নৈপুণ্যের আরো পরিচয় পাই, স্ত্রীর বৈধব্যের সংবাদ শুনে বিবাহবণিকের স্বগতোক্তিতে—'স্বামী স্ত্রীর সকল দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্য দশা কদাচ দর্শন করিতে পায় না। দেখ, আমি কি ভাগ্যবান্! তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হ অদৃষ্ট!'

পঞ্চম অঙ্কে সুমতি-শিশু-উদরপরায়ণ পর্বের অন্তর্নিহিত সুর করুণরসাশ্রিত হলেও পর্বটির উপস্থাপনা উচ্ছ্বসিত হাস্যের মোড়কে বিধৃত। সূচনায় সুমতি ও শিশুর উদরপরায়ণ প্রসঙ্গে কথোপকথন, সুমতিকে রাস্তায় দেখে উদরের উষ্মা, কিন্তু ফলারের খবর দিতে এসেছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের পরিবর্তন, তিন প্রকার ফলারের বর্ণনা, শিশুর ফলারে যাওয়ার বায়না ও সুমতি-উদর কথোপকথন, ফলার-অভিজ্ঞতালাভের বিবরণ নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। ক্ষুধার্ত শিশুকে চপেটাঘাত করে উদরের নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য গমন চিত্রটি দেখে পাঠকের উৎকট হাসির পথ দিয়েই উদ্গত অশ্রু ঝরে পড়ে।

মাধবী-মল্লিকা পর্বও হাস্যকরুণ।

ষষ্ঠ অঙ্কের শুরুতেই বর-প্রসঙ্গে চার বোনের কথোপকথনের সুরে কারুণ্যের ব্যঞ্জনা থাকলেও কৌতুকরসে তা স্নিগ্ধ। 'এ সবের ফল কি বল দেখি শুনি'—শাম্ভবীর জিজ্ঞাসার সচকিত উত্তর দেয় জাহ্নবী—'ফল নাই এমন কথা! দ্বাদশীর দিন সকালেই নারিকেল, শশা, কলা, কতোয়াল আছে'—বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ।

বিবাহবাতুল ও বিরহিপঞ্চাননের উক্তি-প্রত্যুক্তিতেও কৌতুকের আভাস মেলে—

বিরহি। কে হে, বন্ধু নাকি ?

বিবা। হাঁ ভাই, যাবে কি ? চল না যাই।

বিরহি। কোথা হে ?

বিবা। কুলপালকের বাড়ী, বিবাহের নিমন্ত্রণে।

বিরহি। না ভাই, আর বিবাহ দেখিবার প্রয়োজন নাই।

বিবা। দেখিতে যাওয়া ভালো হে, যদি প্রজাপতির গন্ধ গায়ে লাগে।

বিরহি। আর ভাই প্রজাপতির গন্ধে কায নাই, ঐ গন্ধেই অন্ধ হইযা সর্বস্ব বিক্রয় পূর্বক সেই বিবাহবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি।

বিবা। ভাই বুঝ না, তবু ভাল, হইয়াছে তো, আমার যে একবারও হইল না।

প্রেমবঞ্চিত এই দুটি মানুষের কথোপকথন করুণরসাশ্রিত, কিন্তু বর্ণনাগুণে এর মধ্যে যে কৌতুকের ঝিলিক দেখা দেয়, তাও পাঠকের নজর এড়ায় না।

অভব্যচন্দ্র-ধর্মশীল পব সম্পূর্ণটাই কৌতুক রসাশ্রিত। অভব্যচন্দ্র রবাহূত হয়ে কুলপালকের বাড়িতে পৌরোহিত্য করতে এসেছে। ধর্মশীলের সঙ্গে তার নিম্নরূপ কথোপকথন হচ্ছে—

অভব্য। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। (উপবেশন)

ধর্ম। আপনি কে ?

অভব্য। আমি পুরুত।

ধর্ম। কাহার পুরোহিত আপনি ?

অভব্য। ঐ যাঃ। নাম ভুলে গিছি। (চিন্তা করিয়া) হাঁ হাঁ, মহাশয বলিতে পারেন ঐ যে মেয়েরা যাতে চাইল ঝাড়ে তার নাম কি ?

ধর্ম। কূল

অভব্য। হাঁ হাঁ, ঐ ব্যক্তিই আমার যজমান, তার কি এই বাড়ি ?

ধর্ম। কূল কি ? কুলপালক,—সে এই বটে, সে যে আমার যজমান।

অভব্য। কি ? সে আমার যজমান।

ধর্ম। আমি তার কুলপুরোহিত চিরকাল আছি।

অভব্য। আমি তার কুল, ডালা, ধুচুনি, সব পুরোহিত, বহুদিন আছি।

ধর্ম। (সক্রোধে) পরিহাস কর যে ? তুমি কোন সম্পর্কে পুরোহিত ?

অভব্য। মাতামহ সম্পর্কে আমি পুরোহিত।

ধর্ম। কি রূপ ?

অভব্য। কিরূপ আবার কি ? আমার মাতামহ ঠাকুর সেই গ্রাম দিয়া গঙ্গাস্নানে যেতেন, যে গ্রামে কুলপালক বে করে।

ধর্ম্ম। এ অতি অসঙ্গত কথা।

অভব্য। কিসে অসঙ্গত হলো ?

ধর্ম্ম। কাহার মাতামহ কাহার শ্বশুরের গ্রামে কখন গমন করিয়াছে ইহাতে যে সে তাহার যজমান হয় ইহার প্রমাণ কি ?

অভব্য। 'মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোঽভূদ্দশাননঃ' এই শাস্ত্রই প্রমাণ।

ধর্ম্ম। এ বচনের অর্থ কি ?

অভব্য। অর্থ থাকিলে কি যজমানের দ্বারে আসিতাম্ ?…

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবু পরিস্থিতি ও সংলাপের স্বতোবিরুদ্ধতা ও উদ্ভটত্বের মধ্যে যে নির্মল হাসির প্রস্রবণ লুকিয়ে রয়েছে, তা স্বীকার করতেই হয়। অভব্যচন্দ্রের নিজের জ্ঞান-গরিমার পরিচয়-প্রদানও যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ। পুরাণের বিদ্যা সে জাহির করেছে নিম্নরূপে—'পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার। / রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার॥ / দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান। / কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান॥ / পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার / সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার॥/জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন। / সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন॥' এবম্বিধ পুরাণ-জ্ঞানের পরিচয় দানের পর অভব্যচন্দ্র ইতিহাস-বিষয়েও তার অসাধারণ জ্ঞানেরও যে পরিচয় দেয়, তাও, এককথায় বলা যায়, অনবদ্য—'শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী। / রথের তলায় ওই দেখলো সজনি॥/ পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা। / ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর সতা॥' অভব্যচন্দ্রের এহেন বিদ্যাবত্তার পরিচয় উপস্থাপনা যে হাস্যরস সৃজনের প্রয়াসে, তা বলাই বাহুল্য। কারণ এ পর্ব মূল কাহিনীর রসপুষ্টিতে কোনভাবেই সহায়ক নয়। এ পর্ব সংযোজনের উদ্দেশ্য ভিন্নতর ছিল এবং সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু উল্লিখিত বাচালতার সূত্রেই অভব্যচন্দ্র বিবাহের যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, তা নাট্যতাৎপর্যকে এবং ট্র্যাজিক চেতনাকে সূচ্যগ্র করে তুলতে সহায়ক হয়েছে—যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা হাস্যোদ্রেক করে।

বরের পরিচয় প্রসঙ্গে ধর্মশীল-অনৃতাচার্য প্রভৃতির কথোপকথন কৌতুক রসের ভিয়েনে রস-স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

রামনারায়ণ গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু সেই গুরু বিষয়কে লঘু রীতিতে উপস্থাপিত করেছেন। তাই এ নাটকের ছত্রে ছত্রে অফুরন্ত

কৌতুকের ঝরণাধারা উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়। উদ্ভট, কৌতুকজনক পরিস্থিতি ও সংলাপের ছোঁয়ায় পাঠকসাধারণ অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। কিন্তু তাই সব নয়। হাসতে হ'সতে কখন চোখে জল এসে পড়ে—পাঠক ভাবতে শুরু করে তদানীন্তন সমাজের এক প্রকট সমস্যার ভয়াবহতা। একথা ঠিক, মূলত সমাজসংস্কারের মনোভাব নিয়ে রামনারায়ণ নাটক রচনা করতে বসেছিলেন। সমাজের উৎকট ব্যাধিকে নিরাময়ের জন্য তীব্র ঔষধের প্রয়োজন ছিল। শত্রুকে প্রতিরোধ করতে তিনি ধরেছেন শাণিত অস্ত্র—তীব্র বিদ্রূপ ও শ্লেষের চাবুক। এর দ্বারাই প্রতিপক্ষকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে, ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করে শাস্তি দিয়েছেন। রামনারায়ণ জানতেন, এর চেয়ে ভালো মাধ্যম আর কিছু হতে পারে না। স্যাটায়ারের নির্মমতার দ্বারা তিনি আঘাত করেছেন জীবন ও জগতের তীব্র অসংগতিকে। আর এই পথেই এসেছে তাঁর শিল্পসাফল্য। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'নাটুকে' রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' হাস্যরসের (উইট, স্যাটায়ার, হিউমার) এক অফুরন্ত নির্ঝর।

রস নিষ্পত্তি

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' প্রথম সমাজ-সমস্যামূলক নাটক। কৌলীন্য সমস্যার ব্যাপক, সর্বনাশা রূপ এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। কেউ কেউ একে প্রহসন বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলে একে প্রহসন বলা চলে না। এতে হয়ত আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত একটি নাট্যকাহিনী গড়ে ওঠেনি—চরিত্রগুলিও প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বিবর্তন ও পরিবর্তনের পথে, পরিণতির পথে অগ্রসর হয়নি—এর বিন্যাস-রীতিও প্রহসনধর্মী—গুরুগম্ভীর বিষয় লঘু পরিহাস তামাসার সুরে বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক করুণ-রসের আধার—হাসির পিচ্ছিল পথ বেয়ে এ নাটকের বক্তব্য পাঠককে এক দুরবগাহ লবণাক্ত করুণ-রসের মহাসমুদ্রে নিয়ে যায়। হাসি এ নাটকের আবরণ মাত্র, এর অন্তরালে রয়েছে অতলশায়ী করুণ-রসের ফল্গুস্রোত। বস্তুত, এ যেন—'চোখের জল ফেলতে হাসি পায়।' তাই এ নাটক পাঠককে শুধু হাসায় না, কাঁদায়ও।[১]

আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর (serious and certain)। তদানীন্তন

১ "অনেকে এই নাটকটিকে প্রহসন মাত্র বলেছেন। এ যদি প্রহসনের ব্যাপার হয়, জানিনা ক্রন্দনের বিষয় কি?"—বাংলা নাটকের বিবর্তন, সুরেশচন্দ্র মৈত্র পৃঃ ২৯৪।

সমাজে কৌলীন্যপ্রথা যে সর্বনাশা ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, নাট্যকার এ নাটকে সেই সমস্যাকেই উপস্থাপিত করেছেন। 'বিজ্ঞাপন' অংশে নাট্যকারের উক্তি—'পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিতজাতি-মর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোল-কল্পিত কুল-মর্য্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম্। তন্নিমিত্ত 'পতিব্রতোপাখ্যানে' প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে, পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধরীণ্ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তাহার মর্ম এই যে 'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুল-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিয়েছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত "কুলীন কুল-সর্বস্ব" নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন'। রামনারায়ণ রচিত এই নাটকটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, বল্লাল প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথার কারণে বঙ্গদেশে যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, রামনারায়ণ সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে লেখনী ধারণের জন্য অন্তরের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। রঙ্গপুরের জমিদারের বিজ্ঞাপন ছিল বাইরের তাগিদমাত্র। অতএব বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে নাট্যকার সম্যক অবহিত ছিলেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে সমাজসচেতন রামনারায়ণ কৌলীন্যপ্রথার সার্বিক রূপটি তুলে ধরেছেন। এই প্রথা সমাজে যে বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, কুল-প্রথার প্রতি অন্ধ আসক্তির চোরাবালির স্রোতে সমাজের ন্যায়-নীতি, স্নেহ-ভালোবাসা, সতীত্ব, মর্যাদাবোধ কিভাবে তলিয়ে যাচ্ছে, নাট্যকার তার সামগ্রিক চিত্রটিই এখানে অঙ্কিত করেছেন—মোট ছয়টি অঙ্কে।

তবে নাট্যকার যে নাট্যরীতি অবলম্বন করেছেন, তা প্রহসনের। অর্থাৎ কৌতুকজনক বিন্যাসের মাধ্যমে নাট্যবস্তুকে রূপায়িত করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই তাঁর উক্তি—'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।' রামনারায়ণ গুরু বিষয়কে গুরু রীতিতে বর্ণনা না করে লঘু রীতিতে উপস্থাপিত করেছেন। এটাই এ নাটকের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিন্যাস

হাস্যপরিহাসমুখর হলেও তার অন্তরালে করুণরসের কলস্রোতটি অলক্ষ্য থাকে না। আমাদের সিদ্ধান্ত, 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নিছক প্রহসন নয়। এটি একটি করুণ রসাত্মক নাটক। নাটকের মূল সুর করুণ; বিভিন্ন উপাদান, এমনকি হাস্য-রসাত্মক উপাদানও সেই করুণ সুরকেই পুষ্ট করেছে। নাট্যকার মূল বক্তব্য অর্থাৎ কৌলীন্য প্রথার বিষদুষ্টতাকে তীব্র শ্লেষের আঘাতে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ কারণেই রচনারীতিতে ব্যঙ্গের, শ্লেষের পন্থা গ্রহণ করেছেন, সন্দেহ নেই।

মূল নাট্যবস্তু কুলপালকের কন্যাদের বিবাহ উপলক্ষে কৌলীন্যপ্রথার দোষোদ্‌ঘোষণ। নাটকের প্রস্তাবনা অংশে সূত্রধারের বক্তব্যে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট —'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটক রহস্যজনক অপূর্ব নাটক-প্রবন্ধ তৎপ্রস্তাব ব্যাখ্যানে সমাহিত সিদ্ধ করিব…।" তারপর কুলপালকের দুরূহ সমস্যা দিয়ে নাটকের সূত্রপাত। কুলপালক আপন কন্যা চতুষ্টয়ের পাত্র অন্বেষণের বিফলতায় বিড়ম্বিত— 'এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎ পরম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা কি বলিব ?' এবং সমাজের দুরন্ত প্রথার চাপে তিনিও জর্জরিত। কুলধনের সঙ্গে কথোপকথনে তার এই বিড়ম্বিত জীবনের চিত্রই প্রতিফলিত। আবার সেই সঙ্গে কৌলীনাপ্রথার প্রতি তাঁর আস্থা নাট্যবস্তুর ভিত্তিস্থাপন করেছে। সুতরাং প্রথম অঙ্কেই 'নাহিক ক্লেশের লেশ আছি মনস্তাপে,' 'আন্তরিক চিন্তা সদা গ্রাস করে যারে / বাহ্য দুঃখ তার আর কি করিতে পারে'—প্রভৃতি খেদের মাধ্যমে কুলপালকের আত্মিক দাবদাহের চিত্রই প্রতিফলিত।

দ্বিতীয় অঙ্কে শুভাচার্য ও সুধারের কথোপকথনে কৌলীন্যপ্রথার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু 'আচার, বিনয়, বিদ্যা..' ইত্যাদি কুলীনের নবধা লক্ষণের পরিবর্তে বর্তমান কুলীন কি অবস্থায় পরিণত হয়েছে, অনৃতাচার্যের মুখে নাট্যকারের শ্লেষাত্মক উক্তিতে তার পরিচয় নিহিত—

> দাঁড়িয়া প্রস্রাব করে, নিবাস শ্বশুর ঘরে,
>
> মাদকেতে আমোদ বিস্তর।
>
> সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ, গায়ত্রীর আটুনা বন্ধ,
>
> সদানন্দ পূর্ণ কলেবর॥
>
> মুখে সদা বোরিগুড, তুড়ি দিয়া বলে হুট,
>
> হাস্য আস্যে দোষে সাধুজনে।
>
> বড ভাক্ত পাঁচালিতে, কে আঁটিবে বাচালিতে,
>
> এই নয় গুণ লও গণে॥

—নিছক শ্লেষ নয়, রামনারায়ণ এই উক্তি করেছেন কুলীনদের বর্তমান অধঃপতিত চিত্র প্রকাশ করে ট্রাজেডির ভিতটা পত্তন করবার জন্য। সমাজে কুলীন জামাইয়ের জন্য হাহাকার। কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ না দিলে সমাজে পতিত হতে হয়। অথচ সেই কুলীন পাত্র প্রকৃতপক্ষে কি ঘৃণ্য জীব, এটা না বোঝাতে পারলে যন্ত্রণার তীব্রতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

অনৃতাচার্য কুলপালকের কন্যাদের জন্য পাত্র স্থির করেছে—'সেই ষষ্ঠীর বৎস এই ষষ্ঠিবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে···শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে' 'বিলম্ব হইলে বরের সকল গুণ প্রকাশ পাইবে।' সুতরাং এ বিবাহ যে কিরূপ দুর্ভাগ্যজনক হবে, তার আভাস পাওয়া যায়। বিবাহের দিন স্থির কালে গ্রহাচার্যের সঙ্গে আলাপকালে অনৃতাচার্যের স্বগতোক্তি—'শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরা তো সর্বদাই বৈধব্য বেদনা সহ্য করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি?' আর এই সপ্তশলাকের বিবাহ স্থির হওয়া নাট্যকাহিনীতে এক বিষাদময় পথে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

তৃতীয় অঙ্কে কন্যাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর কথোপকথনেও অন্তর্লীন বিষাদের সুর ধ্বনিত। বিগতযৌবনা জাহ্নবী বিবাহের সংবাদে সবিষাদে মন্তব্য করে—'জাহ্নবী যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট। / পাইবে সুন্দর বর সুন্দরের কাট॥ / বরযাত্র তাহে মাত্র যমরাজ দূত। / বাসর শয়ন সুখ হবে অনুভূত॥' শাম্ভবীরও যৌবন গত-প্রায়। বিবাহের সংবাদে সে আশ্চর্যান্বিতা হয়—'শাম্ভবীর বে' এ যে অসম্ভব কথা। / কুলীন কুমারী মোরা 'বর' পাব কোথা॥ / বল্লাল বিহিত কুল অকূল সলিলে। / পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মিলে॥' বস্তুতঃ এই দুই নারীর সাংসারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। সুতরাং কুলীনের ঘরে বিবাহ হলেও, তা নামে মাত্র, এও তারা জানে। তাই বিবাহ-সংবাদ তাদের মনে কোন আনন্দের সঞ্চার করে না। 'বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগে'—জাহ্নবীর সাধ নাই। শাম্ভবী মাকে এক মর্মঘাতী প্রশ্ন করে—'ওমা তুই কি কুল রক্ষা কর্বি, তবে জাতি-রক্ষা কে কর্ব্বে মা?' এই প্রশ্ন কৌলীন্যপ্রথা-বিলাসী সমাজের মুখে সুতীক্ষ্ণ-শায়কের মত বিদ্ধ হয়েছে এবং প্রেমে বঞ্চিতা কুলীন বনিতার বুকভাঙা হাহাকারকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে, সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণী অধোমুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে কন্যার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন, তার মধ্যেও বর্বর সমাজপতিদের অত্যাচারিত ব্যর্থ নারীমনের সুগভীর বেদনার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে—'তবে মা

বাপ, রাজা, ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাত নষ্ট কত্তে বসেছে তখন জাতরক্ষা আর কে কর্ব্বে মা ?'

কামিনীদের নিজ নিজ বর প্রসঙ্গে বিবরণে আপাতদৃষ্টিতে যতই ঠাট্টা-ইয়াকি থাক, তার অন্তর্নিহিত বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাসও অননুভূত থাকেনা। বরং কুলীন কামিনী-গণের বিবাহিত জীবনের এই বিডম্বনার কথা বর্ণনার দ্বারা নাট্যকার কুলীন বিবাহের ঘটনায় অন্য একটি মাত্রা সংযোজিত করেছেন। যশোদা ও ফুলকুমারীর কথোপকথনের মধ্যেও বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। যশোদা বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই বৈধব্যদশা পেয়েছে—তাব জীবন অবিমিশ্র দুঃখের। ফুলকুমারী সধবা হয়েও অন্যান্য কুলীনবনিতাদের মত স্বামীসোহাগ-বঞ্চিতা। স্বামীব দেখা সে কোনদিনই পায় না। ভাগ্যবশে যদি বা একদিন সে এল, ফুলকুমারীর কাটনা-কাটা শেষ কড়িটা প্রণামী দিয়েও তার সন্তুষ্টি বিধান করা গেল না। ফলে সে ক্রোধভরে—'বাবার টোলেতে গিয়া বিটোল শুইল।' আর এদিকে ফুলকুমারী—'একাকিনী বিরহিণী যামিনী জাগিয়া।/নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥' সুতরাং অন্তহীন দুঃখের তাপে জ্বলতে জ্বলতে ফুলকুমারী ভাবে—'এ থাকাচেয়ে না থাকা ভাল। না থাকলে মনে প্রবোদ্দেওয়া যায়, এ থেকেও নেই। একি সামান্যি দুঃখু?' বল্লালী কুলপ্রথার এই সর্বনাশা ভাঙনের জন্যই যশোদার বঞ্চিত, ব্যথাকাতর নারীহৃদয় ডুকরে কেঁদে ওঠে, তীব্র অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করে—'নাত্‌নি আর বলিস্‌নে —বলিস্‌নে, বুক ফেটে যায়!!' (সজল নয়নে) হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের সৃষ্টি কত্তে বলেছিল? কুল তো নয় এ কুলের আঁটি—বড়কঠিন।'

চতুর্থ অঙ্কে অধর্ম্মরুচির কথায় কুলীন বরের জঘন্য চারিত্রিক রূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—'মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন তার হাজাশুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি। কুলীন জামাইয়ের শ্বশুর বাড়িতে জমিদারি চাল—'অহঙ্কার ভরে মোরা না মাড়াই মাটি', কুলমর্যাদা না পেলে কদাচ সেথায় থাকিনে'. কুলীনের ছেলে যত অধিক কাল শ্বশুরবাড়ি থাকে তত অতি আদর বাড়ে, তা থাক্তে পাই কৈ? 'বছরে তিনশত ষাটি দিন বৈত নয়', 'আমি সাড়ে আঠারো গণ্ডা বৈ আর 'বে' করি নাই', 'ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন, আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারিনে, অথবা যার ধর্ম সেই রক্ষা করে, আমাধর্ম্ম এই যে 'আমরা কুলীনের ছেলে, ধর্ম্মের কিছু পেলে ছাড়িনে' সে কথায় কায কি?'—অধর্ম্মরুচির মুখে নাট্যকার এসব উক্তি দিয়েছেন কুলীন জামাইয়ের চরিত্রের

অন্তরঙ্গ রূপটি উদ্‌ঘাটন করবার জন্য। কুলীনদের এই আচরণের ফলে সমাজে দুর্নীতি ও ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত। ধর্মশীলের উক্তিতে তারই ব্যাখ্যা,—'কুকার্যে যে কলীন তাহাকেই 'কুলীন' কহে'—(কুলীনকন্যা ও কুলীনবনিতাকে) অহরহই বিরহ-বেদনা সহ্য করিতে হয়, ও চিরদিনই পিত্রালয়ে থাকিতে হয়, সুতরাং তাহারা কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে? ব্যভিচার দোষে অবশ্যই লিপ্ত হয়।' এই চারিত্রিক অধঃপতন নিঃসন্দেহে শোচনার বিষয়। এই ব্যভিচারও আবার কিভাবে সমাজে স্বীকৃতি পায়, বিবাহবণিক ও অধর্মরুচির কথোপকথনে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত। পরবর্তী পর্বে গর্ভবতী বৃত্তান্তও শোচনার বিষয়। সুমতি-শিশু-উদরপরায়ণ পর্বও নিছক কৌতুকাচ্ছন্ন নয়। ক্ষুধার্ত শিশুর গালে চপেটাঘাত করে বাপ নিমন্ত্রণ খেতে ছুটছে, এর মধ্যে হাসি অপেক্ষা বেদনার জ্বালা কি বেশি ফুটে ওঠে না? মাধবী ও মহিলার কথোপকথনের মধ্যেও কৌলীন্য-প্রথার আঘাতে জর্জরিত দুটি ভিন্নমুখী নারীহৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার প্রকাশ। 'সে আমার পতি নয়, কেবল অধর্মেই পতিত'—স্বামীসোহাগ-বিমুখ নারীর সতীত্ব কিভাবে ব্যভিচারের পঙ্কে হারিয়ে যায়, তার করুণ চিত্রই তো এতে প্রতিফলিত।

ষষ্ঠ অঙ্কে মূল কাহিনীর বিষণ্ণ-করুণ ধারা প্রবাহিত। বল্লালীপ্রথার নিষ্পেষণে নারীর যৌবনের আনন্দ নিঃশেষিত—আজ যৌবন অতিক্রমে বা প্রান্তে এসে বিবাহের সুযোগে মনে শুধু খেদ জাগে—'আহা কি কুলের গুণ পরিসীমা নাই।/ হায়রে বল্লাল তোরে বলিহারি যাই।' অভব্যচন্দ্র কথিত বিবাহের মন্ত্র—'তারপর মেয়েগুলো নাইয়ে এনে 'যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। এবং শ্মশানানলদগ্ধোসি পরিত্যাক্তোসি বান্ধবৈঃ' ইহা বলিয়া বিবাহ দিবে।' এরপর আরো আছে—'পরে গাঁটি ছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্রে আশীর্বাদ করিবে 'সর্বনাশো মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈব চ। সর্বাঙ্গে ধবলাকারঃ অল্পায়ুর্ভব সম্প্রতি।' সত্যই কুলীনকন্যাদের বিবাহের মন্ত্র এর থেকে উপযুক্ত আর কি হতে পারে? অথব, জরাতুর অথবা মৃত্যুপথযাত্রী, বহুভার্যাসম্পন্ন বৃদ্ধের সঙ্গে নামেমাত্র বিবাহ, তারপর সারাজীবন ধরে বৈধব্যদশা অথবা বিধবার মত জীবনযাপন করতে করতে যৌবনবেদনার তিলে তিলে শোচনীয় অপমৃত্যু, নারীত্বের চরম অবমাননা—কুলীন-কন্যার এই তো বিবাহিত জীবনের পরিণতি। নাট্যকার অভব্যচন্দ্রের মুখে এই শ্লেষাত্মক উক্তির মাধ্যমে মানবাত্মার সেই শোচনীয় অমর্যাদা ও অপচয়ের ইঙ্গিতটি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে নির্দেশিত করেছেন। এরপর অনৃতাচার্য ও ধর্মশীলের পদ্য-সংলাপের মাধ্যমে কুলীন বরের রূপগুণের চিত্রটি অঙ্কিত করে ট্রাজেডির গভীরতাকে

সূচিত করেছেন। বিবাহ শেষে নটের মুখে যে ভরতবাক্য উচ্চারিত হয়েছে—'বর দেখি রামাগণ করে গণ্ডগোল। / বিবাহ নির্বাহ হলো হরি হরি বোল।।'—তার মধ্য দিয়ে ট্রাজিক পরিণতি সার্থক রূপলাভ করেছে।

'কুলীন কুলসর্বস্ব' প্রহসন নয়, ট্রাজেডি। মানবাত্মার শোচনীয় অপচয়ের জীবন্ত দলিল এই নাটকে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে নাট্যকার সেই বাঞ্ছিত লক্ষ্যে নির্ভুলভাবে পৌঁছেছেন। এর রসপরিণাম পাঠকমনকে তাই এক অন্তহীন বেদনাসমুদ্রের উপলব্ধি ঘটায়।

শিল্পরীতি

ইতিহাস বিচারে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকটি প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক নয়। এর দু'বছর আগে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন এবং জি. সি. গুপ্তর 'কীর্তিবিলাস' প্রকাশিত হয়। প্রথমটি কমেডি, দ্বিতীয়টি ট্রাজেডি। কিন্তু বিষয়বস্তু, শিল্পরীতি, চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ—কোনদিক দিয়েই নাটক দুটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে না। কিন্তু 'নাটুকে' রামনারায়ণ যেন এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে জ্বলন্ত সমাজ-সমস্যার বাস্তব রূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতির সাহায্যে, একান্তভাবে নিখুঁত না হলেও, যথার্থ নাট্যমূল্যে অভিষিক্ত হয়েছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এই পথিকৃতের প্রথম শিল্পকর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রখর সামাজিক সমস্যার রূপায়ণের যে পথের সূত্রপাত তিনি করলেন, তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, এটাও সবিশেষ স্মরণীয়।

রামনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা ছিল আধুনিক। ফলে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে বিষয়বস্তুর আধুনিকতা থাকলেও এর গঠনরীতি মূলত সংস্কৃত নাট্যরীতিকে অনুসরণ করেছে।

রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকটি মোট ছয়টি দৃশ্যে বিভক্ত। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন—'এই নাটক ষড়ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহার সূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্র বিক্রয়ির দোষোদ্‌ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিদেবন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ ও গ্রন্থ সমাপ্তি। এই রীতিক্রমে এই নাটক

রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপয গ্রহণ করিলে কৃত্রিম-কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।' (বিজ্ঞাপন)

রামনারায়ণ সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণে নাট্যবস্তু রূপায়িত করেছেন। নান্দী অংশে দেবতা, নৃপ, ব্রাহ্মণের বন্দনাগান ও আশীর্বাদপ্রার্থনা। ইহা পূর্বরঙ্গ বিধানের অন্তর্গত। এরপর সূত্রধারের প্রবেশ ('নান্দ্যন্তে সূত্রধার')। সূত্রধারের কর্তব্য—সভাপূজা ('একবার সভা দর্শন করি। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) আহা কি অপূর্ব সভা। এ সভার শোভা ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিলে...।') ও নাট্যবস্তুর পরিচয় দান ('কিন্তু এতাদৃশ সমাজে কোন প্রস্তাব...সমাহিত সিদ্ধ করিব)।'

নাট্যবস্তুর সূত্রেই সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনের মাধ্যমে মূল বক্তব্যের যথোচিত পরিচয় দান। এর ফলে দর্শকসাধারণ নাট্যবস্তু বিষয়ে জ্ঞাত ও কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এরপর মূল নাটকের পাত্রের প্রবেশ ঘটে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনুসারে পাত্র প্রবেশের পঞ্চরীতি—উদ্‌ঘাত্যক (দ্ব্যর্থক, শ্লেষ), প্রবর্তক (ঋতুবর্ণনা), প্রযোগাতিশয (প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গমন), অবগলিত (স্বেচ্ছায় প্রসঙ্গান্তরে গমন), কথোদ্‌ঘাত (সূত্রধারের বাক্য অবিকল উচ্চারণ করতে করতে কোন চরিত্রের প্রবেশ)। নটীর প্রবেশ ও সূত্রধারের সঙ্গে তার কথোপকথনের মধ্যে পূর্বোক্ত চারটি রীতি উদাহৃত হয়েছে। সূত্রধারের সংলাপ অবিকল উচ্চারণ করতে করতে কুলপালকের প্রবেশ কথোদ্‌ঘাতের দৃষ্টান্ত। 'বিবাহ নির্বাহবিধি বিধির ঘটনা'—নটীকে বলা সূত্রধারের এই সংলাপের নেপথ্যে প্রতিধ্বনি তুললেন কুলপালক—'সাধু, ভরতপুত্র, সাধু, প্রজাপতিনির্বন্ধব্যতীত কথন বিবাহ ব্যাপার সমাধা হয় না।' তারপর এই কথার সূত্র ধরেই রঙ্গমঞ্চে তার প্রবেশ—'বিবাহ নির্বাহবিধি বিধির ঘটনা।' সত্য কথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সঙ্গত বটে।' এখান থেকেই মূল দৃশ্যের অবতারণা। এটা সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসারী।

দৃশ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও রামনারায়ণ সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণ করেছেন। সমগ্র নাট্যকাহিনা মোট ছয়টি অঙ্কে বিভক্ত। অঙ্কের মধ্যবর্তী দৃশ্য পরিকল্পনার কোন স্বতন্ত্র নামকরণ নেই। এমন কি নাট্যকার দৃশ্য শব্দটিও ব্যবহার করেননি। কিন্তু প্রতি অঙ্কের মধ্যে একাধিক দৃশ্যের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধরা যাক, তৃতীয় অঙ্কটি। এখানে একটি অঙ্কের মধ্যে বস্তুত তিনটি দৃশ্য

সংযোজিত হয়েছে—ব্রাহ্মণী ও তাঁর চার কন্যা, রসিকা-দেবল, কামিনীগণ। চতুর্থ অঙ্কে ভোলা-ধর্মশীল-তর্কবাগীশ, ধর্মশীল-অধর্মরুচি, বিবাহবণিক-অধর্মরুচি, বিবাহবণিক-উত্তম, ধর্মশীল-গর্ভবতী পর্বগুলি বস্তুত দৃশ্যবিশেষ। ষষ্ঠ অঙ্কে জাহ্নবী শাম্ভবী-কামিনী-কিশোরী পর্ব, বিরহিপঞ্চানন—বিবাহবাতুল, কুলপালক-ধর্মশীল-বর-অনৃতাচার্য-অভব্যচন্দ্র-অনৃতাচার্য পর্ব স্বতন্ত্র দৃশ্যের সূচনা করেছে। এভাবে নাট্যকার মোট ছয়টি অঙ্কের মধ্যে নাট্যকাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন। একই অঙ্কের মধ্যে তিনি দৃশ্যান্তর ঘটিয়েছেন, পৃথকভাবে দৃশ্যযোজনা করেননি।

'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে অন্যভাবেও সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে মঞ্চে স্থানান্তর গমন রীতি নাট্যশাস্ত্র নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভোলা পুরুতের নিকট যাচ্ছে। পথে 'কিঞ্চিৎ গমন করিয়া' তার মনে হল 'ঐ ঝাঃ কেচ্চেখানা ভুলি আলাম···'। কিয়দ্দূর গিয়া' সে ঝিয়ের বাড়ি পৌছাল। '(আকাশে কর্ণ দিয়া) অ্যা, কি বল্যি? হেরিয়ে গেচে? যাক্‌গে, আবার মোরে ফিরি আষ্টে হলো, যাই তবে'—প্রভৃতি আকাশ-ভাষণ, দূরত্ব অতিক্রমণ নাট্যশাস্ত্র অনুমোদিত। বাঁনের বাড়ি থেকে পুরুতঠাকুরের বাড়ি পর্যন্ত অনেকদূর পথ মঞ্চে পরিক্রমণের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। তর্কবাগীশ ও ধর্মশীলের পথ অতিক্রম কালেই অধর্মরুচির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন। গর্ভবতী পর্বও অনুরূপ অবস্থায় দৃশ্যায়িত হয়েছে। '(কিয়দ্দূর যাইয়া) এই যে কুলপালকের বাটী, চল প্রবিষ্ট হওয়া যাউক।'—মঞ্চপরিক্রমণের মাধ্যমে দূরত্ব অতিক্রমণের বিশিষ্ট রীতি।

সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাট্যকার দ্বিবিধ রীতি অনুসরণ করেছেন। এই নাটকের সংলাপ মূলত গদ্য—কিন্তু যত্রতত্র পদ্যের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। সেই পদ্য যে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব এবং ঘটনা বিশ্লেষণে সর্বত্র সাহায্য করেছে, এমন নয়। মনে হয়, রামনারায়ণ এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি পূর্বসূরীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের আর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচনার কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন। আবার একথাও স্বীকার্য যে, রামনারায়ণ অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতবহুল বাক্যবন্ধ ব্যবহার করেছেন, ফলে সংলাপ দুর্বোধ্য ও কষ্টকল্পিত হয়েছে।

'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে কৌলীন্যপ্রথার জঘন্য রূপের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু কাহিনীসূত্র বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত সন্দেহ নেই। মোট ছয়টি অঙ্কে ছয়টি বিচ্ছিন্ন বিষয় উদাহৃত হয়েছে—কুলপালকের কন্যাদের বিবাহ, কুলকামিনীগণের

আচার ব্যবহার, শুক্রাবিক্রয়ার দোষ উদ্‌ঘাটন, নানা রহস্য ও বিরহিপঞ্চাননের বিয়োগ পরিদেবন, বিবাহ নির্বাহ ও গ্রন্থসমাপ্তি। এ নাটকের সুর কৌতুকরসে পূর্ণ। কিন্তু সেই কৌতুকরসের অন্তরালে ফল্গুস্রোতের মত ট্রাজেডির অন্তর্লীন স্রোতধারা প্রবাহিত।

নাট্যকার যথার্থই বলেছেন—'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম-কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।' বস্তুত রামনারায়ণ নিদারুণ শোকাবহ বিষয়কে তাঁর নাট্যকাহিনীর উপাদান হিসাবে নিয়েছেন। তবে তার বিন্যাস-ভঙ্গিতে হাস্যরসের ধারাকে অবলম্বন করেছেন। বস্তুত হাসিও যে কত করুণ হয়ে উঠতে পারে, 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে তার সার্থক উদাহরণ লক্ষ্যণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফুলকুমারী-যশোদা পর্বের কথা বলা যেতে পারে। বালবিধবা, বৃদ্ধা যশোদা এবং বিবাহিতা অথচ স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা, যুবতী ফুলকুমারী—দু'জনে অসম বয়সের হলেও দু'জনের জীবনই যেন একই দুর্ভাগ্যের সূত্রে গাঁথা। একজন স্বামীকে শৈশবেই হারিয়েছে, অন্যজনের স্বামী থেকেও নেই। দু'জনের বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী কৌতুক-রসের ভিয়েনে পরিবেশিত হলেও চরম নাট্যমুহূর্তে ট্রাজিক বেদনার অবরুদ্ধ স্রোত-ধারার উৎসমুখ খুলে যায়। যশোদা ডুকরে কেঁদে ওঠে—'নাত্‌নি আর বলিস্‌নে —বলিস্‌নে বুক ফেটে যায়!!!' ফুলকুমারীও বলে—'ঠান্‌দিদি, এ থাকাচেয়ে না থাকা ভাল!' তখন বঞ্চিত হৃদয়ের শুষ্ক মরুর উত্তাপ আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি।' উদরপরায়ণ-সুমতি-শিশু পর্বের বিন্যাস-ভঙ্গিও কৌতুকাবহ হলেও এর অন্তর্নিহিত সুর নিঃসন্দেহে অশ্রু-করুণ। বস্তুত পৃথকভাবে কোন দৃশ্য বা পর্বের নাম উল্লেখ না করেও বলা চলে যে, রামনারায়ণ আলোচ্য নাটকের কাহিনী-ধারাকে প্রহসনের আঙ্গিকে বিন্যস্ত করলেও রস-বিচারে এটি আদৌ প্রহসন নয়, নাটক। গুরুতর (serious and certain) বিষয়বস্তু ব্যঙ্গ-কৌতুকের উজ্জ্বল ঝলকানিতে আরো উদ্ভাসিত হয়েছে। বস্তুত হাসির আবরণে—উইট, হিউমার, স্যাটায়ারের সমাহারে—আলোচ্য নাটকের বক্তব্য সার্থকভাবে প্রতি-বিম্বিত হয়েছে। সিরিয়াস বিষয়বস্তুর বিন্যাসভঙ্গি সিরিয়াস হলে বাঞ্ছিত ফল-লাভ আদৌ সম্ভবপর হত না, একথা অসংশয়িত ভাবে বলা যায়।

আলোচ্য নাটকে প্লটের শিথিলতা রয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' উদ্দেশ্যমূলক নাটক। কৌলীন্যপ্রথার দোষোদ্‌ঘোষণ নাট্যকারের

মূল লক্ষ্য। সুতরাং নাট্যকার সামাজিক গুরুদায়িত্বের কথা মনে রেখেই এ নাটক রচনা করেছেন। 'বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত "কুলীন কুল-সর্বস্ব" নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।'—এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে এই নাটকটি রচিত ও পুরস্কৃত হয়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, রামনারায়ণ সামাজিক প্রেক্ষিতের আনুপূর্বিক ও সামগ্রিক চিত্রটি এতে তুলে ধরবেন এবং কার্যত তাই করেছেনও। এই নাট্যকাহিনার মূল বক্তব্য কুলীন কুলপালকের কন্যাদের বিবাহ বর্ণনা। কিন্তু সেই বিবাহের যথার্থ রূপটি কি, তার পরিণামই বা কিরূপ এবং সেই সঙ্গে কৌলীন্য-মদ-গর্বিত সমাজের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ চেহারাটাই বা কিরূপ বীভৎস, পুতিগন্ধময়—তার সার্বিক চেহারাটা রামনারায়ণ নিপুণ, কুশলী শিল্পীর তুলিকায় সার্থকরূপে অঙ্কিত করেছেন। সত্য বটে, প্লটের বাঁধুনি এতে অনুপস্থিত, আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত (with a beginning, middle and an end) নাট্যকাহিনার সন্ধান এ নাটকে পাওয়া যায় না। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, বিভিন্ন খণ্ডচিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার এখানে একটি অখণ্ড ভাবসত্য উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন।—তখন ছিল এ বড় আশ্চর্য সমাজ-ব্যবস্থা, যেখানে ধর্মরক্ষার জন্য গৌরীদান প্রথা প্রচলিত ছিল, ভঙ্গজ হওয়ার ভয়ে কুলীনকন্যার বর জুটত না, আবার বারেন্দ্র সমাজে অর্থের অভাবে পাত্রের বিয়ে হত না, এক কুলীন বর, তা সে যতই অথর্ব, বিকলাঙ্গ, থুত্থুরে বুড়ো হোক, গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে করে কুলীনকন্যার আইবুড়ো নাম ঘোচাত, অন্তর্জলি যাত্রাকালেও যার বিয়ের বিরাম ছিল না,— আর স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা কুলীনকন্যা যৌবনের তাড়নায় যখন অবৈধ সন্তানের জন্ম দিত, তখন কুলীনকন্যার পিতা বা আত্মীয়স্বজন সেই দুর্নীতিকে দেখেও দেখত না, আর কুলীন স্বামী অর্থের বিনিময়ে সেই অবৈধ সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত বা লজ্জিত হত না। এই ব্রাহ্মণ-সমাজের আর এক অংশে ছিল কন্যাবিক্রয় প্রথা—এও সমাজের আর এক জঘন্য ক্ষত। সমাজসচেতন নাট্যকার রামনারায়ণ তাঁর নাটকের রূপকল্পে এই সামগ্রিক চিত্রটিই ধরতে চেয়েছেন। আর তার ফলেই কুলীনকুলের সমাজরক্ষার প্রচেষ্টার অন্তরালে চারিত্রিক, নৈতিক, আত্মিক অধোগতির চিত্র বিভিন্ন অংশে তাঁকে তুলে ধরতে হয়েছে। কুলপালকের কন্যাদের বিবাহের আনন্দের অন্তরালে যে ট্রাজেডির সকরুণ সুর লুকিয়ে আছে, তা চিত্রিত করাই ছিল নাট্যকারের প্রধান

উদ্দেশ্য। নাটকের সমাপ্তির লগ্নে সেই বহুধারা একটি শমে এসে পৌঁছেছে ভরত-বচনের মধ্যে—'বর দেখি রামাগণ করে গণ্ডগোল। বিবাহ নির্বাহ হলো হরি হরি বোল॥' কৌলীন্যপ্রথার যূপকাষ্ঠে কন্যাদের বিবাহ নয়, বস্তুত বলিদানই দেওয়া হয়। অভব্যচন্দ্রের অভব্য সংলাপে তারই ইঙ্গিত—'তারপর মেয়েগুলো নাইয়ে এনে যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। এবং শ্মশানানল দগ্ধোসি পরিত্যক্তোসি বান্ধবৈঃ' ইহা বলিয়া বিবাহ দিবো—পরে গাঁটিছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্রে আশীর্বাদ করিবে 'সর্বনাশো মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈব চ। সর্বাঙ্গে ধবলাকারঃ অল্লায়ুর্ভব সম্প্রতি।' যথার্থই এরূপ বিবাহের মন্ত্র এছাড়া আর কি হতে পারে? কুলীনকন্যার এরূপ বিবাহ আসলে বিবাহ নয়, শ্মশান-যাত্রাবিশেষ—নাট্যকারের এই শ্লেষাত্মক বক্তব্যই নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিণতিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং নাটকটি মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, সন্ধি—এই পঞ্চসন্ধিযুক্ত নয়, তা অবশ্যই বলা চলে। তবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে একটা ভাব-ঐক্য (unity of impressions) যে ব্যঞ্জিত হয়েছে সেটাই এ নাটকের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।

গঠনরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্যও এখানে লক্ষ্যণীয়। এ নাটকে ত্রয়ী ঐক্য (unity of time, place and action) কতদূর রক্ষিত হয়েছে, তাও দেখা দরকার। ঘটনা-স্থান সম্পর্কে বলা যায় যে, একস্থানে কোন ঘটনা ঘটেনি। নাট্যকার কোন মঞ্চনির্দেশ করেননি বটে, তবে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক কিংবা যাত্রা-নাটকের রীতি অবলম্বন করে তিনি স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন চতুর্থ গর্ভাঙ্কে পথ পরিক্রমণ দ্বারা বিভিন্ন অবস্থানের নির্দেশ করা হচ্ছে।—'কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝাঃ কেচ্চেখানা ভুলি আলাম।', '(কিয়দ্দূর গিয়া) এই মোর ঝীয়ের ঘর—'। '(অধিক দূর গিয়া স্বগত) ঐ পুরুঠ্ ঠাকুরের বাড়ি দেক্‌তি পাচ্ছি—'। '(নিকটে গিয়া প্রকাশে) ও পুরুঠ্ ঠাকর, ঘরে গো?'। এই রীতি নাটকের প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

এই নাটকে একই গর্ভাঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন দৃশ্যের সংস্থাপন করা হয়েছে। একই দৃশ্যপটে বিভিন্ন পর্বের উপস্থাপনা নাট্যরীতি অনুমোদিত। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায়—একই গর্ভাঙ্কে যে সব দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে, তাদের ঘটনাস্থল এক নয়। যেমন ধরা যাক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কটি। এখানে সূচনায় কন্যাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণী-পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছে বাড়ির ভিতরে, এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। দ্বিতীয় অংশের রসিকা-দেবল পর্বটির রূপায়ণ পথে। তৃতীয় অংশের কামিনীগণ পর্বটির উপস্থাপন বাড়ির সামনে পথে এবং বাড়ির চত্বরে, চতুর্থ পর্বটিও (ফুলকুমারী-যশোদা) সেইখানেই। কিন্তু

নাট্যকার পৃথক পৃথক দৃশ্যে এগুলি বিন্যস্ত করেননি,—পাঠকদের এগুলি অনুমান করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে নাট্যকার সংস্কৃত নাটক ও যাত্রাপালার রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এটা স্পষ্টই বুঝা যায়।

বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, 'টুলো রামনারায়ণ' সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইংরেজি নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে তিনি সেই পরিমাণে ছিলেন অনবহিত। ফলে তাঁর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রগতির স্বাক্ষর থাকলেও নাট্যরীতিতে তিনি প্রাচীনতার অনুগামী ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না।

আলোচ্য নাটকের গঠন-প্রণালীকে বহু সমালোচক ত্রুটি-যুক্ত মনে করেছেন। জনৈক সমালোচকের মতে, 'এইরূপ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের সংমিশ্রণ থাকিলেও "কুলীন কুলসর্বস্বের" গঠনপ্রণালী নাটকোচিত হয় নাই।…যদিও এই ছয়টি চিত্র অল্পাধিক মূল বিষয়েরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ, তথাপি এইগুলি এরূপ ভাবে মূল ঘটনার সহিত গ্রথিত হইয়াছে যে, ঐগুলি পৃথক করিয়া লইলেও মূল ঘটনার বিশেষ অঙ্গহানি হয় না।'[১] সমালোচকের এই উক্তি কতটা যুক্তিসহ, তা বিচার্য বিষয়। নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য—কৌলীন্যপ্রথার দোষোদ্‌ঘোষণ। তদানীন্তন সমাজে কৌলীন্যপ্রথার কারণে কি সর্বনাশা পরিণাম দেখা দিয়েছিল, অনাচার, ব্যভিচার, ভণ্ডামি কিভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল, নাট্যকার তাঁর পটে সেই সার্বিক রূপটিই চিত্রিত করতে চেয়েছেন। আর এজন্যই সামূহিক চিত্রের সমাহার। আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্যেই উভয়ের রূপ সুস্পষ্ট হয়। তাছাড়া, আরো একটা কথাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মৌলিক নাটক রচিত হলেও, সেই ভদ্রার্জুন ও কীর্তিবিলাস নাটক দু'খানি প্রায় অপাঠ্য, অভিনয়ের মাধ্যমেও তার শিল্প-স্বাক্ষর জনসমাজে পরিচিত হয়নি। সেক্ষেত্রে রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক, বলতে গেলে, স্বরাটের মহিমা নিয়েই আবির্ভূত হল। প্রথম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই নাটকটিকে শিল্পরীতির পথ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়েছিল। তাই ত্রুটি নয়, তার সাফল্যকেই বড় করে দেখা উচিত।

---

১. দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় পৃঃ ২৭।

উপসংহার

'কুলীন কুলসর্বস্ব' প্রথম অভিনীত বাংলা মৌলিক নাটক। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়রাম বসাকের চড়কডাঙ্গা স্ট্রীটের বাড়িতে এর প্রথম অভিনয়। এরপর এখানে এবং আরো নানাস্থানেই এ নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। সমাজ-সমস্যামূলক এই নাটকটি যে রক্ষণশীলতা নামক ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছিল বেশ ভালোভাবেই, সে ইতিহাসও আমরা জানতে পারি। কিন্তু বাঙালির সৌভাগ্য এই যে, এ নাটকের জয়যাত্রা রক্ষণশীলদের প্রতিবন্ধকতায় থেমে থাকেনি। স্বগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রখর সহানুভূতি নিয়ে নাটকে রামনারায়ণ মেয়েদের দুরবস্থা নিয়ে যে অনুপম নাট্যশিল্প রচনা করেছিলেন, যে যুগোপযোগী ভাষ্যদান করেছিলেন, বর্তমানের বধূনির্যাতনের যুগেও যে তার আবেদন স্বীকৃত হবে, তা বলাই বাহুল্য। সেই যুগেও রামনারায়ণ যে প্রগতিশীলতার, আধুনিক জীবনদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। বস্তুতঃ রামনারায়ণ নাট্যক্ষেত্রে যে পথ নির্মাণ করেছিলেন, সেই পথ ধরেই মধুসূদন ও দীনবন্ধুর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। এটা বললে অত্যুক্তি হয় না।

সনাতন গোস্বামী

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব

নাটক।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোপ
যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সম্বৎ ১৯১১।

বিজ্ঞাপন।

পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোল কল্পিত কুল-মর্য্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম্ তন্নিমিত্ত "পতিব্রতোপাখ্যানে" প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে, পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন্ তাহার মর্ম্ম এই যে "বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন"। পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া ছিলাম্ তাহাতে উক্ত গুণগ্রাহি দেশহিতৈষি মহোদয় তদ্দৃষ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া অঙ্গীকৃত ৫০ টাকা আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং অসামান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহানুভব আমার প্রার্থনানুসারে পুস্তকও আমাকে দেন, আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম॥

এই নাটক ষড়্‌ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহার সূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনী গণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্র বিক্রয়ির দোষোদ্‌ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিদেবন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্ব্বা'হ ও গ্রন্থ সমাপ্তি। এই রীতি ক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল রহস্য জনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম-কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে প্রার্থনা সজ্জনগণ সমীপে ইহা আদরণীয় হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

কুলপালক	প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ।
কুলধন	কুলপালকের প্রতিবাসী।
শুভাচার্য্য	ঘটক।
সুধার	
অনৃতাচার্য্য	
গ্রহাচার্য্য	গৃহবিপ্র।
ব্রাহ্মণী	কুলপালকের স্ত্রী।
জাহ্নবী	কুলপালকের কন্যা
শাম্ভবী	
কামিনী	
কিশোরী	
রসিকা	নাপিত স্ত্রী।
দেবল	পূজক ব্রাহ্মণ।
মোহিনী প্রভৃতি ১১	প্রতিবাসি কুলীন কামিনীগণ।
ভোলা	কুলপালকের কৃষাণ ভৃত্য, নীচ জাতি।
ধর্ম্মশীল	পুরোহিত।
তর্কবাগীশ	ধর্ম্মশীলের ছাত্র।
অধর্ম্মরুচি	বৈদেশিক কুলীন ব্রাহ্মণ।
বিবাহ বণিক	
উত্তম	বিবাহ বণিকের ক্ষেত্রজ পুত্র।
উদর পরায়ণ	বৈদিক ব্রাহ্মণ।
সুমতি	উদর পরায়ণের স্ত্রী।
শিশু	উদর পরায়ণের পুত্র।
ন্যায়ালঙ্কার	অধ্যাপক।
মাধবী	সুশিক্ষিতা কুলীন কন্যা।
মহিলা	কুলীন কন্যা।
বিরহি পঞ্চানন	মৃত পত্নীক বংশজ।
বিবাহ বাতুল	অকৃত বিবাহ বংশজ।
অভব্য চন্দ্র	বৈদেশিক ব্যক্তি।

জগদীশ্বরো

জয়তি ।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক

নান্দী* ।

শিশু শশি শোভে ভালে, বপু বিভূষিত কালে,
গলে কালকূটের কালিমা ।
রজত ভূধর শোভা, ভক্তজন মনোলোভা,
এ রূপের দিতে নাহি সীমা ॥
বাম উরুপরে বসি, অকলঙ্ক উমা শশী
পুলকে প্রফুল্ল কলেবর ।
নিতান্ত কিঙ্করজনে, কৃপা বিন্দু বিতরণে,
ত্রাণ কর ওহে গঙ্গাধর ॥

অপর

কুলময়ী কুলারাধ্যা, কুলভক্ত জন বাধ্যা,
জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী ।
অমূল কল্পিত কুল, সমূলে করি নির্ম্মূল,
সত্যকুল বৃদ্ধি বিধায়িনী ॥
কুলকাণ্ডে মনোমত, লিখা যাও আর কত
জাগো মাগো জগত সংসারে ।
তোমা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি তাই
পড়ে আমি অকূল পাথারে ॥

---

* নাটকের প্রথমে ব্রাহ্মণাদির আশীর্ব্বাদ বাক্য ।

আশীর্ব্বচন সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎপ্রবর্ত্ততে। দেবদ্বিজনৃপাদীনাং
তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা। দর্পণঃ ।

(কোন ব্রাহ্মণ এই নান্দী পাঠ করিয়া প্রস্থান করিলেন, অনন্তর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার। আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই একবার সভা দর্শন করি। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) আহা কি অপূর্ব্ব সভা, এ সভার শোভা ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিলে কাহার না অন্তরাত্মা নিতান্ত সম্মোহ সাগরে সন্তরণ করে। এই সভা অগণ্য গাম্ভীর্য্যৌদার্য্য ধৈর্য্যাদিগুণ মণ্ডিত পণ্ডিত জনে আকীর্ণ, এবং প্রভূততর বদান্য দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন অসামান্য ধনিগণে পরিপূর্ণ, অতএব এস্থানে আমার অজস্র-পরিশ্রম-শিক্ষিত সঙ্গীত শাস্ত্রের পরীক্ষা প্রদান একান্ত সমুচিত হইয়াছে, যেহেতু সজ্জন সমাজ মধ্যে অপরীক্ষিত বিদ্যা, অনগ্নি পরিশোধিত-স্বর্ণ জাতির ন্যায়, নিতান্ত বিশ্বসনীয়া হয় না তন্নিমিত্ত তদ্বিষয়ে যত্ন করা অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু এই রসভাব-তালাভিনয়-তাণ্ডব-পণ্ডিত-মণ্ডলী, এতন্মধ্যে কোন্ প্রস্তাবাধিকার করিয়া স্বকীয় সংকল্প সিদ্ধ করি ? (কিঞ্চিৎ চিন্তিতের ন্যায় ঊর্দ্ধবিলোকন করিয়া) হঁ, স্মৃতি-পথারূঢ় হইয়াছে, পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক সঙ্গীত সামাজিকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে পারে না। অতএব বর্ত্তমান কালীন বঙ্গদেশোৎসঙ্গবর্ত্তি স্বরঙ্গ রঙ্গপুরস্থ কুণ্ডীনিবাসি যশোরাশি শ্রীল শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহোদয় মতানুসারি শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা কর্ত্তৃক সুমধুর সাধু ভাষায় রচিত যে "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নামক রহস্যজনক অপূর্ব্ব নাটক-প্রবন্ধ তৎপ্রস্তাব গানাদি সমীহিত সিদ্ধ করিব, এক্ষণে প্রেয়সীকে আহ্বান করিয়া এতৎ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হই।

(নেপথ্যের * অভিমুখে অবলোকন করিয়া নটীর প্রতি)

প্রিয়ে যদি তোমার বেশ বিন্যাস হইয়া থাকে, ত্বরায় আইস।

নটীর প্রবেশ।

নটী। আর্য্যপুত্র† এই আমি আসিলাম, আজ্ঞা করুন কি করিব ?

সূত্রধার। কান্তে এই সুচির-সম্ভোগ-সুখ-নিধান মদন-সামন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সময় সমাগত, এমত পরম মহোৎসব সময়ে নিরুৎসুকা হইয়া কোথা চলে, সজ্জন সমাজে সঙ্গীত আরম্ভ কর।

নটী। যে আজ্ঞে। (গীতারম্ভ করিল)

* বেশ বিন্যাস গৃহ।

† নাটকে স্বামিসম্বোধন

"চূত মুকুল কুল, সঞ্চল দলি কুল,
গুণ২ রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল, কলরব সংকুল,
রঞ্জিত বাদন তানে॥
রতিপতি নর্ত্তন, বিরস বিকর্ত্তন,
শুভ ঋতুরাজ সমাজে।
নব২ কুসুমিত, বিপিন সুবাসিত,
ধীর সমীর বিরাজে"।

সূত্রধার। প্রিয়ে সাধু২, উত্তম সংগীত করিয়াছ, তোমার এই সুকণ্ঠ নির্গলিত, রাগ রাগিণী সংকলিত, রসভাব, সম্ভাবিত, মধুরতর সুসঙ্গীত শ্রবণে সমস্ত সামাজিক লোক চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় একতানান্তঃকরণে রহিয়াছেন। ইহারা প্রথমত তোমার লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরীক্ষণেই মুগ্ধপ্রায় ছিলেন, এক্ষণে তোমার অসামান্য সঙ্গীত নৈপুণ্য যে কি পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিয়াছে তাহা বাক্‌পথাতীত॥

একেত কমল কলি, প্রফুল্ল হইলে অলি,
রূপ হেরি হরষিত হয়।
আবার যখন তায়, মকরন্দ গন্ধ পায়,
আনন্দের সীমা নাহি রয়॥

প্রেয়সি, দেখ দেখ এই সভাসদগণের চিত্তচকোর তোমার শ্রীমুখচন্দ্র গলিত চন্দ্রিকারূপ মধুর গান সুধা পান করিয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পিপাসা প্রকাশ করিতেছে এ সময়ে বিবাহ ব্যাপার ঘটিত "কুলীন কুল সর্ব্বস্ব" নামক নূতন নাটক দর্শনামৃত দানে উহাকে তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

নটী। (বিবাহ শব্দ শ্রবণে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়, পুরুষের কি নিষ্ঠুর স্বভাব! স্নেহ কাহাকে বলে ইহারা কখনই জানে না, কেবল আপন সুখেই সদা সুখী। আমরা অবলা জাতি, অতি, সরলা, আমার অন্তঃকরণ চিরদিনই চিন্তিত আছে যেহেতু আমার একটি মাত্র কুমারী, সে অতি সুকুমারী, বিশেষত বয়েস্ হইয়াছে। নাথ, দেখদেখি তুমি কি নিষ্ঠুর, তাহার বিবাহের কথাও একবার উল্লেখ কর না, কেবল আমোদপ্রমোদেই মগ্ন আছ, অতএব তোমারি রঙ্গরসের সময়, তুমিই নাটক লইয়া থাক।

সূত্রধার। (ঈষদ্ধাস্যমুখে) স্ত্রী জাতি অতি অবোধ। প্রিয়ে, চিরদিন চিন্তাকে সহচরী করিয়া সুখমুখাব-লোকনে বিরত হইলে কি হইবে? শুভাদৃষ্ট ব্যতীত কদাচ

কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হয় না, বিশেষত বিবাহ কার্য্য, আমি তন্নিমিত্ত তৎপ্রতি প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, দেখি অদৃষ্টে কি হয়।

নটী। নাথ, তুমি কি আমাকে ভুলাইবার নিমিত্ত মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ?

সূত্রধার। না, না, প্রিয়ে, এমত, কদাচ মনে করো না, আমি যথার্থ কহিতেছি

প্রেয়সী তোমাকে নাহি করি প্রতারণা।
বিবাহ নির্ব্বাহ বিধি বিধির ঘটনা॥

(নেপথ্যস্থিত কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা শ্রবণ করিয়া) সাধু ভরতপুত্র* সাধু, প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ ব্যতীত কখন বিবাহব্যাপার সমাধা হয় না।

নটী। নাথ কি বলিলে, অদৃষ্টে যাহা হয় বলিয়া চেষ্টা না করা কি পুরুষের কর্ম্ম? ছি! ছি! তুমি বিজ্ঞ হইয়া কি করিতেছ?

সূত্রধার। প্রিয়ে, তুমি অতি বুদ্ধিমতী, যথার্থ বলিয়াছ, এক্ষণে সঙ্গীত পরিত্যাগ করিয়া তুহিতার হিতকারে নিহিত মন্ত্রণা করা উচিত। কিন্তু তাহা নিভৃতস্থানেই করিব যেহেতু মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। ঐ দেখ! কে এস্থানে আসিতেছে, অতএব চল নির্জ্জনে গিয়া মন্ত্রণা করি। উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা

[অনন্তর কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

কুলপালক। (স্বগত**) "বিবাহ নির্ব্বাহবিধি বিধির ঘটনা" সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যানয়, সঙ্গত বটে। আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্ত্তির সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যা দিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছে না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি। দেখ, আমার সংসার রাজ-সংসার বলিলেও বলা যায়, কিছুই অনটন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, কিন্তু দেখাদেখি কি দৈব বিড়ম্বনা কিছুতেই মনস্তুষ্টি হইতেছে না; কন্যা ভাবগ্রস্ত হইয়া চিন্তা-নিমীলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি। তায় কি

* নট।

‡ প্রকৃত। যদেব উত্থাপিকা নটী সূত্রধারাদির উক্তি প্রত্যুক্তি॥

নটী বিদূষকোবাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে। চিত্রৈর্ব্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ আমুখংতত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপিস দর্পণঃ

** আপনা আপনি বলা।

অশ্রাব্যং খলুযদ্বস্তুতদিহ স্বগতং মতং দর্পণঃ।

ক্লেশ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন "তুচ্ছগৃহাঃ স্থূলপটা যব গোধূম শালিনঃ। প্রলয়েঽপি ন সীদন্তি যদি কন্যা ন জায়তে" অর্থাৎ অনুচ্চগৃহ, স্থূল বস্ত্র, যব-গোধূমশালি গৃহির গৃহে যদি কন্যা না হয় তবে প্রলয়েও অবসাদ হয়না, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে, কন্যা জন্মই গৃহস্থাশ্রমির অশেষ ক্লেশ দায়ক। বিশেষতঃ অস্মাদৃশকুলীনসন্তান দিগের। প্রত্যক্ষ দেখ বিধাতার কি বিড়ম্বনা! আমার গৃহে কন্যা চতুষ্টয় অবতীর্ণ হইয়াছেন! এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎ পরম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা কি বলিব? প্রকাশে) আঃ পোড়া দেশীয়-দিগের কি দুরন্ত প্রথা! অতিমন্দ২, এমন্ দেখি নাই।

[কুলধন মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

কুলধন। কে হে! বন্ধু না কি, এ রোদ্দুরের বেলা মেলা কি বক্‌চো হে, কেন এত রাগত কেন?

কুলপালক। বলি, তাই বলি ভাই তোমার দেশের পায়ে দণ্ডবৎ, এমন্ দেশ কোথাও দেখি না।

কুলধন। যথার্থ ভাই, এদেশে খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না; হাট নাই, বাজার নাই, তরকারির মধ্যে পুঁইশাগ, গব্যের মধ্যে তেঁতুল, দেশে থাকাই দুঃসাধ্য।

কুলপালক। না, তা না হে।

কুলধন। তবে, দেশের প্রতি এত ত্যাক্ত কেন?

কুলপালক। আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কারু হয় না, সংসার করিতে হইলে সকলেরি কি সকল কর্ম্ম সময়ে হইয়া থাকে, কিছুতেই কি বিলম্ব হয় না। তা বিলম্বেই বা কি, বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায় কি গর্ভেই বিবাহ দিব? দেশের লোকেরা তাহা বিবেচনা করে না, নিরপরাধে আমাকে নিন্দাবাদ করিতেছে, ভাই তুমি বিবেচনা কর দেখি সমযোগ্য পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি? কি এগন যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়া চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব?

কুলধন। হাঃ রেখে দেও তুমি দেশের কথা, এদেশে কেবল দ্বেষ বৈ নেই, কেন তোমার মেয়েরা তো বড, বড় হয় নাই তাদের কতো বয়েস্ হয়েছে?

কুলপালক। বয়সের কথা কি বলিব ভাই, বয়স্ কোথা? বড কন্যার অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই; মধ্যমটির সকল কেশও পক্ক হয় নাই; তৃতীয় কন্যাও প্রায় মধ্যমটীর মত; আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে সূতিকা গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত পৌষ মাসে সবে পচিশ বৎসরে পড়িয়াছে।

কুলধন। বিলক্ষণ, এত অল্প বয়সে তুমি তাদের বে দিও না, দেশের লোকের কথায় কি করে ; আমারে অমনি নিন্দে কর্চ্চে ; আমার একটি মেয়ে, তার বে হয়নি বলে কতো কথাই বল্‌চে, বলুক্, বেটারা কি কর্বে।

কুলপালক। তোমার মেয়ের বয়স কত ভাই ?

কুলধন। বয়েস্ বড় অধিক নয়, সে দিন কুষ্ঠি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি মেয়েটার বয়স কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজি খানা জীর্ণ হএছে আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে এই বড় পিসীর বইসী।

কুলপালক। তা ভাই আমি তথাপি দেশীয় দিগের দ্বেষে ও ব্রাহ্মণীর আদেশে স্বয়ং পাত্রান্বেষণ করিতেছি এবং অনৃতাচার্য্য ও শুভাচার্য্য নামক দুই ঘটককে ঐ উদ্দেশে দেশে২ প্রেরণ করিয়াছি ; তাঁহারা উপযুক্ত পাত্র, বরপাত্র পরীক্ষায় বিলক্ষণ পারগ ; কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট দোষে অদ্যাবধি তাঁহারাও প্রত্যাগত হইতেছেন না, অদ্য প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের অন্বেষণে পর্য্যটন করিতেছি। আঃ কি ক্লেশ ? সংসারাশ্রম মাদৃশব্যক্তির কেবল অবিশ্রাম দুঃখেরি স্থান। এই সংসার—কালরাত্রিতে কতই দুঃখদুর্দ্দিন কিন্তু সুখ খদ্যোত অতি অল্প। আমি অদ্য প্রাতঃকালাবধি ভ্রমণ করিয়া কি সামান্য পরিশ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়াছি ?

কুলধন। চল ভাই এখন ঘরে যাওয়া যাউক, অনেক বেলা হয়েছে।

কুলপালক। (উর্দ্ধবিলোকন করিয়া,) একি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন ? এক্ষণ অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপ শান্তি নিমিত্ত ছায়া প্রধান পাদপ তলে পল্লবশয্যায় শয়ান হইয়া সংবেশসুখ অনুভব করিতেছে। মহীরুহচয় একান্ত পবন-পাত-বিরহে সজ্জন মানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। বরাহগণ পল্বলপঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ নিলীন করিয়া রহিয়াছে। কুবরীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে। ভিক্ষোপজীবি জীবিরা সাতিশয় বুভুক্ষায় ক্ষীণকায় ও ব্যগ্র হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে সঞ্চারণ করিতেছে। গৃহিগণ স্বস্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষুধা নিবারণোপায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। কুলবধূরা সুমধুর শাকসূপাপূপাদি নানাবিধ ভোজনীয় বস্তু প্রস্তুত করণে অন্তঃকরণ অর্পণ করিতেছে। অপ্রবাসিরা ভোজনাবসানে সুখাসনে সমাসীন হইয়া কর্পূর-পূর-সুবাসিত তাম্বুল পূরিত মুখে সুখে পরিজন সহ আলাপন করিতেছে। প্রবাসিরা জঠরজ্বালায় ব্যাকুল হইয়া দেহধারণমাত্রোপযোগি দ্রব্যের সংযোগ করিতেছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনোরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে পয়ঃফেননিভ

পর্য্যঙ্কোপরি পরিচারিকা করকম্পিত তালবৃন্তে বীজ্যমান হওত আমীলিত লোচনে ঐশ্বর্য্যসুখ আস্বাদন করিতেছে। অতএব এতাদৃশ সময়েও আমি পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি! গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম সম্পন্ন করি অথবা এই ক্লেশ নিতান্ত অসহ্য নহে যেহেতু।

তপতু তপন এষ ক্লেশলেশোপি নাস্মাদ্দহতু চরণদেশে ভূমিরস্মাচ্চ কিন্তু।
বিষমবিষয় চিন্তাত্যন্তসন্তাপিতানাং প্রচুরমপি হি দুঃখং বাহ্যমল্পং বিভাতি।

সূর্য্যের আতপে আর পৃথিবীর তাপে।
নাহিক ক্লেশের লেশ আছি মনস্তাপে॥
আন্তরিক চিন্তা সদা গ্রাস করে যারে।
বাহ্যদুঃখ তার আর কি করিতে পারে॥

ভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

[শুভাচার্য্য ও সুধীরের প্রবেশ]

সুধীর। তার পর মহাশয় ?

শুভাচার্য্য। নিজাভীষ্ট নিষ্ণাত চেতা বিনেতা পুরাসীন্মহীপো মহানাদিশূরঃ। প্রতীচীদিশঃ পঞ্চ বিপ্রান্ সুধীরান্ সমানীতবান্ যঃ স্বয়ং যজ্ঞযোগ্যান্।

সেই আপন অভীষ্ট দেবাভিনিবিষ্টমনা আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চবিপ্রকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন। তাঁহারা সদারভৃত্য হইয়া সমাগমন পূর্ব্বক বিজ্ঞবর যজ্ঞশীল মহারাজ আদিশূরের আজ্ঞানুসারে এই গৌড়ভূমিতে বসতি করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদিগের বংশ পরম্পরা বিস্তৃত হইলে বল্লাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা প্রচার করেন, যথা "শাণ্ডিল্য গোত্রে ভটনারায়ণ বংশজাত আদিবরাহ বন্দ্য; কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশ প্রসূত সুলোচন ভট্ট; ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশোৎপন্ন পুরন্দর মুখয়টী; সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ বংশোদ্ভব বীবব্রত গাঙ্গুলী ও সুধীর কুন্দ; বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশ সম্ভূত সুরভি ঘোষবাল, কবি কাঞ্জিলাল, ও বলিপুতি গুপ্ত। এই অষ্টবিধ মুখ্যকুলীন এবং ঐ সকল গোত্রজ ও ভটনারায়ণ প্রভৃতি ঐ সকল ব্যক্তির বংশ সম্ভূত গৌণ চতুর্দ্দশ প্রকার শ্রোত্রিয়, এই দ্বাবিংশতি প্রকার কুলীন; আর অন্যান্য কতিপয় শ্রোত্রিয় প্রথমত বল্লাল ভূপাল কর্তৃক বিভক্ত হয়, পরে লক্ষ্মণসেন পূর্ব্বোক্ত মুখ্য অষ্টবিধ কুলীনদিগের ঊনবিংশতি পুত্রের সমীকরণ করেন, অনন্তর দেবীবর ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি ষট্ত্রিংশৎ মেল করিয়াছেন"।

[অনৃতাচার্য্যের প্রবেশ]

অনৃ। আঃ কে হা ও—এত বকে দেন ? মাথা ধরিল যে।

সুধীর। ঘটক মহাশয়, পলায়ন করা উচিত, ঐ আসিতেছে !

শুভ। কে ও আসতেছে ?

সুধীর। আয়াতি জাতিকুলাবপ্লবধূমকেতুঃ সেতুর্বিবাহ ঘটনাম্বুধিপারহেতুঃ। অর্থামিষার্থমনপেক্ষিত ধর্ম্মকর্ম্মা চূড়ামণির্বিতথবাগনৃতার্য্যশর্ম্মা।

আসিল পরের জাতি কুল নাশ হেতু।
বিবাহ নির্ব্বাহ বিধি জলধির সেতু॥
অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম।
চূড়ামণি মিথ্যাবাদী অনৃতার্য্য শর্ম্মা॥

শুভ। আসিলই বা, তাহে ক্ষতি কি ?

অনৃ। আঃ গোবিন্দহে, কি কষ্ট, এই সাতিশয় আতপতাপে তাপিত ও পথিপরিশ্রান্ত হইয়া নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আহারাবসানে শয়নমাত্রেই অতিমাত্র-পরিশ্রম-জনিত নিদ্রা আমার লোচন গ্রাহিণী হইয়াছে ইতিমধ্যে কাহার এই কর্ণকুহর-ভেদি কোলাহল রব ? আমার স্বপক্ক নিদ্রা পরিত্যক্ত হইল ! কন্তুং কে হে তুমি ?

শুভ। আমি শুভাচার্য্য শর্ম্মা, রাঢ়দেশীয় ত্রিপুরাপুরে নিবাস, কলিকাতার ঘোষাল সম্প্রদায়ত নাম, আর্য্য কুলাচার্য্যের পুত্র, পণোর সন্তান। আপনি কে ?

অনৃ। অহং ঘটক ; অনৃতাচার্য্য চূড়ামণি। তোমার পিতামহের নাম কি হে ?

শুভ। মহাশয় আপনি ঘটক চূড়ামণি, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনিই বলুন।

অনৃ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শুনিবে ?—বাপুহে তোমার বংশাবলিতো আমার নয়নপথে রহিয়াছে, আমরা তেমন ঘটক নই, ফাঁকিজুকি নাই। চণ্ডীপুরে কিনুরাম ঘোষাল বাস করিতেন, কেমন সত্য কি না ?

শুভ। বলুন না, শুনা যাউক।

অনৃ। সেই কিনুরামের পুত্র হরিনাথ, হরির পুত্র মহেশচন্দ্র, মহেশের পুত্র নিমাইচরণ, নিমাইর পুত্র বলরাম ও রামরাম, বলরাম নিঃসন্তান ; রামরামের পুত্র গোকুলচন্দ্র, তাঁহার পুত্র কেশব, শঙ্কর, গঙ্গাধর, তন্মধ্যে গঙ্গাধর নিঃসন্তান ; শঙ্করের পুত্র শ্যামসুন্দর, তাহার পুত্র বৈদ্যনাথ, তিনিও নিঃসন্তান ; অতএব গঙ্গাধর ও শঙ্করের বংশ নাই। কেশবের পুত্র হরিহর ও কবিবর, কবিবর মাতামহ সম্পর্কে গৌহাটিতে বাটী করিয়াছিলেন, হরিহরের পুত্র মাধব চন্দ্র তিনি ত্রিপুরাপুরে উঠিয়া যান, সেই মাধবের পাঁচ পুত্র—শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসাচার্য্য, জ্ঞানাচার্য্য, ধর্ম্মাচার্য্য, ও কুশলাচার্য্য, সেই কুশলাচার্য্যই তোমার পিতামহ, কেমন হইয়াছে কি না ? আমি কি জানি না "পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁই ইহা ছাড়া বামণ নাই" আমার অবিদিত কোন্ ঘর আছে ?

শুভ। আপনকার পিতৃ ঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

অনৃ। আঁা, কি বলোচো ? কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড় গ্রীষ্ম।

শুভ। মহাশয়ের পিতার নাম কি ?

অনৃ। বড় মশা।

শুভ। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র ?

অনৃ। অধিক দিন হইল আমার পিতৃ ঠাকুরের পরলোক হইয়াছে।

শুভ। (সহাস্য মুখে) আমি পরলোক ও ইহলোকের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন?

অনৃ। বিলম্ব কর, অধিক দিন তাঁহার কাল হইয়াছে, নাম প্রায় এক প্রকার বিস্মৃত হওয়া গিয়াছে, স্মরণ করি তবেতো বলিব, তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে?

শুভ। কে আছহে—শুনিলে? ইনি এমনি ঘটক নিজ পিতৃ নামও বিস্মৃত হন! কিন্তু অন্যের পিতৃ পিতামহের নাম ইঁহার মুখাগ্রবর্ত্তি, সেসময়ে একটাও ঠেকেনা!

অনৃ। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি? যাহা আইসে একটা বলিলেই হয়। ভাল সেকথা থাকুক—তুমি কোন ব্যবসায়ী?

শুভ। আমিও ঘটকতা করিয়া থাকি।

অনৃ। (সগর্ব্বে) হুঁ, তুমিও ঘটক! ভাল ভাল, বল দেখি ঘটকের লক্ষণ কি?

শুভ। আটক কি? আপনকার নিকটে পরিচিত হওয়া উচিত বটে, তবে শুনুন—

ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকশ্চাংশকস্তথা।

মূষকঃস্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ।

অনৃ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (শব্দে হাসিল)।

শুভ। মহাশয় পরিহাস করিবেন না, আর এক লক্ষণ কহিতেছি শুনুন।

কে নো বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বীমুর্ব্বী

তলে কুলভৃতাং কুলবর্ত্তনংবা।

অত্যন্তসূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং জানন্তি

তে হি ঘটকা নতু যোজকাদ্যাঃ।

অনৃ। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) একি, আঁা, গোবিন্দ২ কি বল? কতগুলা বকিলেই কি হয়? এতো হাড়িঝাঁচণ্ডার পূজার মন্ত্র।

শুভ। (সবিষাদে) চূড়ামণি মহাশয়, কুলদীপিকাতো যাহা লিখিত আছে আমি কহিলাম আপনি অগ্রাহ্য করিলেন, ভাল আপনিই বলুন ঘটকের লক্ষণ কি?

অনৃ। হাঁ, বাপু হে পথে আইস, আমার নিকটে শুনবে? শুন।

প্রবঞ্চনা পরায়ণ, মুখে প্রিয় আলাপন,

ধর্ম্মাধর্ম্মে নাই বিচারণ।

না পাইলে বলে কটু, স্বোদর পূরণে পটু,

দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ।

বাচাল আচার ভ্রষ্ট, জাতি কুল করে নষ্ট,
দুষ্টমতি মুর্খে'র প্রবর।
বিবাদে নারদসম, মুর্ত্তিমান্ যেন তম,
হয় নয় বল সুধীবর।

বেল্লিক পুরাণে মাত্লামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপুহে, এসকল জান্তে হয়, এসকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় না। আমি এসকল শিখিয়া ও এসকল গুণে ভূষিত হইয়াই "ঘটক চূড়ামণি" নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ গৃহে কতশত কৈবর্ত্তকন্যা চালাএছি; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ঘরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব-চক্রবর্ত্তির সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটাএছি; আর কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, সমস্ত তো আমার শরীরের আভরণ। এই ১৪ই মাঘে খড়ীবাটীর কচিরাম চক্রবর্ত্তির কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিদ্দক্ষিণা পাইয়া মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার একপ অপরূপ চাতুর্য্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখনও কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘট্কালি দেখাও। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন কাহাকে বলে?

শুভ। যাঁহার কুল আছে তাঁহাকেই কুলীন কহে, কুলের লক্ষণ শুনুন

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥

অনৃ। আঃ কি আপদ্; না বাপু, আর তোমার বিদ্যা প্রকাশে কায নাই, বুঝিয়াছি; তুমি কাহার নিকটে পড়িয়াছ? হা রাম, এতো বয়স্ হইল কিছুই কর নাই! গোবিন্দ২, একি? বরং এটাও এক দিন বলিলে বলিতে পার। যথা

বলদো লাঙ্গলং যোলঃ কর্দ্দমং মইকর্ষণং।
ছ্যাচাং ক্ষেত্রং কোদালঞ্চ নবধা কাস্তে লক্ষণং।

ইহা কথঞ্চিৎ হইলেও হইতে পারে, ফলতঃ কুলের লক্ষণ জাতিভেদে বিভিন্ন, তন্মধ্যে বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগের কুলের প্রায়িক লক্ষণ এই।

দাঁড়িয়া প্রস্রাব করে, নিবাস শ্বশুর ঘরে,
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।
সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ, গায়ত্রীর আট্ক্যা বন্ধ,
সদানন্দ পূর্ণ কলেবর॥

মুখে সদা বেরিগুড, তুড়ি দিয়া বলে হট,
হাস্ত আস্তে দোষে সাধুজনে।
বড ভক্তি পাঁচালিতে, কে আঁটিবে বাচালিতে,
এই নয় গুণ লও গণে ॥

ওহে নূতন ঘটক শুনিলে, বুঝিয়াছ? না আমার বাগ্‌যুদ্ধে তোমার বুদ্ধির ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, কেবল নিষ্ঠাবৃত্তি শিখিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। এক্ষণ যাও, ভাল লোকের নিকট কিছুকাল মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরে ঘটকালি করো।

শুভ। (জনান্তিকে)* ওহে ভাই সুধীর, একি? উঃ, বেটা কি দাম্ভিক! বোধ হয় দম্ভই শরীরী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর মহামাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে! প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন 'বৈয়াকরণকিরাতাদপশব্দমৃগাঃ ক গচ্ছেয়ুঃ। যদি ঘটক চিকিৎসক বৈতালিক বদন কন্দরা ন স্যুঃ" ॥ অর্থাৎ যদি ঘটক, ভিষক, ও স্তুতি পাঠকের মুখস্বরূপ গুহা না থাকিত তাহা হইলে বৈয়াকরণব্যাধ হইতে অশুদ্ধবাক্য স্বরূপ মৃগেরা কোথায় আর পলায়ন করিত? ফলতঃ ইহারাই সর্ব্বদা অশুদ্ধ কহিয়া থাকে। এই হস্তিমূর্খ', ইহার কিছুই অকার্য্য নাই, ইহার মতের অন্যথা কহিলে উত্তম মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বোধাদিদোষবসতেরসতঃ প্রচণ্ড সত্বস্য
সর্ব্ব বিনয়াম্বুমরুস্থলস্য। মূর্খস্য দুঃখকরদর্শন
ভাষণস্য ক্রুরাত্মনো হত্র ভুবনে কিমকার্য্যমাস্ত।
বিনয় জলের মরু, দুঃখ দানে কল্প তরু,
অসত অশেষ দোষ যার।
প্রচণ্ড স্বভাব ধারী, ক্রুর মূর্খ বলে তারি,
অকার্য্য কি আছে বল তার ॥

অতএব এস্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত। (প্রকাশে) যে আজ্ঞা মহাশয়, এক্ষণ আমি আর কিঞ্চিত পাঠ করিতে যাই।

[সুধীর ও শুভাচার্য্যের প্রস্থান]

অনৃ। আঃ রাম বল আপদ্ গেল—নিষ্কণ্টক হইলাম; অথবা আমি যে স্থানে থাকি সে স্থানে কি অন্যের আর প্রভুত্ব খাটে? এক্ষণ স্বকার্য্য সাধনে যত্ন

* অলাপ্য জনের পরোক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সংলাপ।
অন্যোন্যামন্ত্রণং যত্স্যাৎ জনান্তেতজ্জনান্তিক মিত্যালঙ্কারিকাঃ ॥

করি। (পুরোভাগে অবলোকন করিয়া) হাঁ এই যে চিন্তিতান্তঃকরণে বন্দ্যোপাধ্যায় আসিতেছেন।

[কুলপালকের প্রবেশ]

কুল। (স্বগত) হা বিধে! আমার কি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুঞ্জ২ মহাপাতক ছিল? কি ক্লেশ! কত দিনে এ দীনের প্রতি দীননাথ দয়া করিবেন? কবে আমাকে চিন্তাবিহীন করিবেন? শাস্ত্রে কথিত আছে "চিন্তাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নামে গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিনং"। অর্থাৎ চিতা ও চিন্তার মধ্যে চিন্তাই প্রধান যেহেতু চিতা জীবহীন মৃত ব্যক্তিকে দগ্ধ করে, কিন্তু চিন্তা সজীবকে দগ্ধ করিয়া থাকে। আর মনুষ্য দিগের চিন্তাই জ্বর, চিন্তাপেক্ষা ক্লেশদায়ক কেহই নয়। আমি কন্যাভার গ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দীনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি, কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন? কবে কুলরক্ষা করিবেন? আমি বহু দিন হইল, যে অঘটন-ঘটনা-পটু ঘটক দ্বয়কে ঐ উদ্দেশে পাঠাইয়া ছিলাম, তাঁহারাও অদ্যাবধি প্রত্যাগত হইলেন না, কি করি? (সম্মুখে দেখিয়া প্রফুল্ল মুখে প্রকাশে) এই যে ঘটক চুড়ামণি মহাশয়—আসিতে আজ্ঞা হয়। মহাত্মব্যক্তির শরীর সর্ব্বদা স্বোপার্জ্জিত পুণ্যে পবিত্র, তাহাতে আধিব্যাধির বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে, তথাপি অনিন্দিত শিষ্টাচারানুসারে আপনকার শরীরের কুশল প্রশ্নে আত্মাকে পুনরুক্ত নিযুক্ত করিতেছি—মহাশয়ের শরীরের কুশল?

অনৃ। হাঁ, তুমি মহাকুল-প্রসূত, তোমার দর্শনেই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল।

কুল। আপনকার যে অসাধারণ স্নেহ আছে তাহাতেই বোধ হইতেছে আপনি আমার বিষয় বিস্মৃত না হইয়া থাকিবেন।

অনৃ। (স্বগত) আগে ঘটকালি বিদায়ের বাহুল্য স্বীকার করাই, কি আগেই সে সংবাদ দি? না, আগে ঘটকালিই চুকাই। (প্রকাশে) না, বিস্মৃত হই নাই, কন্যাদিগের দুরদৃষ্ট দোষই বিঘ্নজনক হইয়াছে। তোমার নিদেশানুসারে অশেষ দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছি না, দেখি কি হয়।

কুল। (সবিষাদ মনে) তবে এক্ষণে উপায় কি? কন্যাদিগের কি বিবাহ হইবে না?

অনৃ। জগদীশ্বরের মনে থাকে অবশ্যই হইবে। আমি তোমার অনুরোধে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি। বিস্তর পর্য্যটনে এক পাত্র পাইয়াছিলাম, সে সর্বগুণাক্রান্ত বটে, তা হইলে কি হইবে? সে আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। আমি অশেষ প্রকার প্রবোধে সম্মুখীন করিয়াছি কিন্তু সে বড় কঠিন কর্ম,

ব্যয় বাহুল্য করিতে হয়। আর আমারও [illegible], অতএব তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? দেখা যাউক যাহা হয়।

কুল। কুলাচার্য্য মহাশয়, আমি আপনাকে একশত মুদ্রা পুরস্কার দিব, আর বৈবাহিক ব্যাপারে কৃপণতা করিব না। পাত্র কেমন, কৌলীন্য-মান্য কি প্রকার, বলুন?

অনু। (স্বগত) কি? আমি যাহা স্থির করি তাহাতে আমার দোষের আশঙ্কা? [illegible] ঠাকুরের [illegible] পরম পবিত্র পাত্র, কুলের মুকুট, [illegible] কুলীনদিগের প্রামাণিক যে সকল গুণ আছে তাহার চতুর্গুণ গুণ ভূষিত, কিন্তু আমি একটা কথা এ সময়ে কহিয়া রাখি [illegible] মানুষের ন্যায় যেন পরে আমায় [illegible]।

কুল। [illegible]?

অনু। [illegible] কি? সেই [illegible]। [illegible] তোমার কি অদৃষ্ট, [illegible] ঘটিয়াছে। [illegible] গুণালঙ্কৃত কুলীন-মহারথি-কুমারের [illegible]।

কুল। [illegible] মহাশয়, [illegible]।

অনু। [illegible]

কু। [illegible]

অনু। [illegible] ঠাকুর কোথা, গৃহে আছ?

[গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ।]

গ্রহ। [illegible] পঞ্চমী, [illegible] নক্ষত্র, যাত্রা [illegible]। কে গো আমার ডাকিলে?

কুল। আমি, আমার কন্যাদিগের বিবাহ, একটি উত্তম দিন দেখিয়া দেও।

গ্রহ। (পঞ্জিকা দেখিয়া) মহাশয়, ২৯ শে বৈশাখ উত্তম দিন আছে।

অনু। (স্বগত) এ কি আপদ্ হইল, কুলীন কন্যার বিবাহ তাহার আবার দিন? বিলম্ব হইলে বরের গুণ সকল প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে বিবাহ হওয়া দুষ্কর, অথবা অন্য ঘটক আসিলেও এককালি বিবাহের সঙ্কোচ হইবে। অতএব কপটতা প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহাচার্য্যকে প্রতারিত করি। (প্রকাশে) কিহে গ্রহাচার্য্য, কি বলিতেছ? ২৯শে বৈশাখ কবে?

গ্রহ। বর্তমান এই বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস।

অনু। সব অশুদ্ধ। এ বৎসরে সংক্রান্তিই নাই। কেবল পৌষমাসে এক পিষ্টক সংক্রান্তি আছে এতাবন্মাত্র, আর শ্রীরামপুরের পঞ্জিকামতে ভাদ্রে অরন্ধন সংক্রান্তির সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য সংক্রান্তিতো দেখিতে পাই না, তুমি সংক্রান্তি আবার কোথা পাইলে? সে দিনে কি আপনিই সংক্রান্তি হইবে?

গ্রহ। মহাশয় আপনি কি আমাকে উপহাস করিতেছেন?

অনু। না না; তুমি কি উপহাসের যোগ্যপাত্র। ভাল, যাহা কহিয়াছ বিস্মৃতিক্রমেই হইয়া থাকবে, ওকথায় আর প্রয়োজন নাই। বল দেখি আজি কি বার?

গ্রহ। অদ্য শনিবার।

অনু। (ঈষৎক্রোধে) আঃ শনিবার তো সকলি জানে, শনিবার কতক্ষণ আছে?

গ্রহ। একি, ভাল লোকের নিকটে আসিয়াছি! শনিবার আবার কতক্ষণ থাকে?

অনু। দূর বেটা গণ্ডমূর্খ, পাষণ্ড, পাঁজি দেখিতে জানিস্ না। অদ্য শনিবার ৯ দণ্ড ২৬ পল ছিল, পরে মঙ্গল বার হইয়াছে।

গ্রহ। আপনি কি অনবধানতায় কহিতেছেন?

অনু। (সক্রোধে) কি বেটা, আমার অনবধানতা? আমি সর্ব্ব শাস্ত্র এককালে উদ্যাপন করিয়াছি, শাস্ত্রে কহে "শনি মঙ্গলবারে, দিনের সার," দেখ্ দেখি শনি মঙ্গলবারের যোগ আছে কি না? তুই বেটা জানিস্ আর কেহই জ্যোতিষ শাস্ত্র জানে না? গণ্ডার গণ্ডার বচন আমার কণ্ঠায় কণ্ঠায় রহিয়াছে, দুঃ চাটে ছাড়িবো, শুনবি? "শনি রবি মঙ্গলের গুঁড়া, কে কর বাসয়া শশুর খুড়া। দশ তিন তেরো এক, পেটের ছেলে গুণে দেখ। সাত ছয় এগার, তিন নয় তের" ॥ এ সকল ছাড়া কাকচরিত্র গ্রন্থে আমার ব্যুৎপত্তি আছে কিনা শুনবি, শোন? "কাগাতো কাগা, মড়ার মুণ্ডে দিয়া পা, ডেকে বল্‌চে গেলে মা"। শুনলে? যা বেটা তোর সহিত বিচারে প্রয়োজন নাই, কালি রাত্রিতে বিবাহ হইতে পারে কি না তুই তাহাই বলে যা।

গ্রহ। (সমীচীন রূপে পঞ্জিকা দেখিয়া) না মহাশয়, কল্য দিন হইবে না।

অনু। (বিবৃত মুখে) কল্য কি সূর্য্যোদয় হইবে না? দিন হইবেনা কেন? এ বেটা বাতুল নাকি?

গ্রহ। (ঈষৎ ক্রোধে) আমি 'বিবাহের দিন হইবে না' বলিয়াছি।

অনু। আঃ কি আপদ, ওরে মূর্খ বিবাহ কি দিবসে হয়?

গ্রহ। না না, তা নয়, কল্য বিবাহের নক্ষত্র নাই, তাহাতেই বলিয়াছি 'কল্য নিশাতে বিবাহ হইতে পারে না'।

অনু। এ বেটা রাইতে কাণা না কি? এ কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি, কল্য তুই আমার নিকটে আসিস্, তোকে আকাশে কত নক্ষত্র দেখাইয়া দিব, খুঁজিয়া দেখিস্ একটাও কি বিবাহের হইবে না?

গ্রহ। কল্য সপ্তশলাক, কেমন করিয়া বিবাহ হইবে?

অনু। (স্বগত) শুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরাতো সর্ব্বদাই বৈধব্য বেদনা সহ্য করে, সুতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি? অতএব ইহাকে বাক্‌ছলে প্রতারিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা করি। (প্রকাশে) আঃ, কি অশুদ্ধ কহিলি? সপ্তশলাক কিরে মূর্খ? সপ্তশ্লাঘা বল, বন্দ্যোপাধ্যায় যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে সহস্র শ্লাঘা আছে, তুই কি সপ্তশ্লাঘা দেখাইতেছিস্?

গ্রহ। কল্য দশযোগ ভঙ্গ।

অনু। শুনিলেন মহাশয়? এই মাঙ্গলিক কর্ম্ম অনেক যোগাযোগে ঘটিতেছে, কিন্তু এ বেটা মঙ্গলে যোগভঙ্গের অনুসন্ধান করে।

গ্রহ। কল্য যুক্তবেধ।

অনু। আঃ, কি পাপ! গ্রহ! স্বরে কর্ম্ম —তুই দূর হ, আর দিন দেখিতে হইবেনা।

(গ্রহাচার্য্যের প্রস্থান।)

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি এই মূর্খ দৈবজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিবেন না, আমরা ঘটক বটে, কিন্তু নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি রাখি, বিশেষতঃ নবদ্বীপ নিবাসি পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "কল্য উত্তম দিন, এবং শতসহস্র বিবাহ কল্য হইবে," আর আপনিই বিবেচনা করুন্ যদি কল্য উত্তম দিন না হইত তাহা হইলে এতদ্দেশীয় রাজা ঈশ্বরনাথ বাহাদুর নিজ পিতৃ শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেন না। অতএব যেদিনে রাজা রাজড়ারা কর্ম্ম কাণ্ড করে সেই দিন 'মন্দ' যে কহে সে অতি মূর্খ। তাহার কথা কখন গ্রাহ্য নয়।

কুল। মহাশয়, ভাল দিনের কথা দূরে থাকু, এক্ষণ দ্রব্যাসাদন ব্যতিরেকে কি প্রকারে এত শীঘ্র কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে, তাহার উপায় কি?

অনু। আয়োজনেরই এত বাহুল্য কি?

কুল। বরযাত্র, কন্যাযাত্র, ও পুরোহিত প্রভৃতি সকলকে ভোজনওতো করাইতে হইবে?

অনৃ। অবশ্য হইবে, বরযাত্র আমি, কন্যাযাত্র তুমি, আর পৌরোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে।

কুল। (সহাস্য বদনে) তবে নাপিতের কর্ম্ম'ও কি আপনি করিবেন?

অনৃ। আপনি একণে পরিহাস রাখুন, বিবাহের উদ্যোগ দেখুন? "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" মঙ্গল কার্য্যে অনেক বিঘ্ন, যদ্যপি সে বর হাতছাড়া হয় তাহা হইলে বড় বিভ্রাট, তাহা ঘটিবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এক ঘটক ঐ সন্ধানে ফিরিতেছে।

কুল। (সভয়ে) যে আজ্ঞা মহাশয়, আমি আয়োজনে রহিলাম, আপনি কন্যা পাত্র লইয়া সত্বর আসিবেন, একণে বাটিতে যাই বেলা নাই, সন্ধ্যা হইল দেখুন।

আগ্নেয়পিণ্ডইব চণ্ডকরে প্রতীচীপাথোনিধেঃ পততি পাথসি পুষ্করান্তাৎ। তূর্ণং ততস্তিমিরসন্ততিরুত্থিতেব ধূমাবলী ত্রিভুবনং কবলীকরোতি ।।

গগন হইতে রবি, অনল সদৃশ ছবি,
পড়িল পশ্চিম জলধিতে।
তাহা হতে ধূমাকার, অতিগাঢ় অন্ধকার,
উঠিতেছে ত্রিলোক গ্রাসিতে ।।

অতএব একণে আপনিও নিজ নিকেতনে গমন করুন।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

[ব্রাহ্মণীর প্রবেশ]

ব্রাহ্মণী। (অপক্বনিদ্রা কষায়িত লোচন উভয় করে মার্জ্জন করিতে২)

আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে।
শরীর জুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে॥
চিরকাল যত সাধ ছিল মোর মনে।
সে সাধ পুরাব আজি জামাতার সনে॥
জামাই এসেছে শুনি আসি প্রতিবাসি।
নানা রঙ্গ রস কথা কবে মৃদু হাসি॥
কার্য্যের ছলনা করি থাকিয়া সেখানে।
শুনিব জামাই বেটা কতো কথা জানে॥
যখন জামাই এসে বসিবে বাহিরে।
ধিরে ধিরে যাব আর চাব ফিরে ফিরে॥
স্নেহ করে নানা দ্রব্য জুটায়ে আনিব।
যদি সব্ না খায় মাথার দিব্য দিব॥
শাশুড়ি হইয়া বসি ঘোমটা টানিব।
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র কতই ছাড়িব॥
ভেড়া করে সে বেটাকে রাখিব বাটীতে।
যেন আর নাহি চায় ঘরেতে যাইতে॥
এসবেতে যবে বশ হইবে জামাই।
আর কি থাকিবে তবে সুখের কামাই॥

(চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) এ কি, এতো বেলা হয়েছে, ও মা, কি হলো? আজি আমার নানান্ কর্ম্ম। আজি আমার এতো বেলা পর্য্যন্ত ঘুমবার সময়? কিন্তু ঘুমেরও দোষ নাই, সমস্ত রাত্ত উয্যুগ সংযুগ কত্তে জেগে ছিলাম, যেমন্ ভোর বেলা পড়িচি অমনি যবে ঘুমিইচি, তাইতেই অনেক বেলা হয়েচে; তা এখন আমি কি করি? অনেক কর্ম্ম। আগে কি অধিবাসের বরণডালা সাজাব কি পাড়ার মেয়েদ্দের নিমন্তন্ন কত্তে যাব? কি অন্য কোন কর্ম্ম কর্ব্বো? (কিঞ্চিত্ভাবিয়া) না এসব পরে হবে আগে মেয়েদ্দের ডেকে এসম্বাদ বলি, তাদ্দের 'বে,' তারাও এখন টের পায়নি। লোকে বলে "ওঠ ছুঁড়ি তোর বে" আমার মেয়েদ্দের কপালে তাই ঘটেছে। (উচ্চৈঃ স্বরে) কোথা গো মেয়েরা সকল?

জাহ্ন্বি শাম্ভবি আর কামিনি কিশরি।
এস২ কন্যাগণ সভে ত্বরা করি ॥

জাহ্নবী। যাই।

শাম্ভবী। কেন মা?

কামিনী। ওমা এই যে আমি এইচি, কি মা?

ব্রাহ্মণী। ওগো, শুন্‌সে গো তোরা শুন্‌সে।

[জাহ্নবী শাম্ভবী ও কামিনীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। ওমা, কি?

শাম্ভবী। ওমা কেন ডাক্লি?

কামিনী। ও মা, কেন২, বাবা কি ডাকচে?

ব্রাহ্মণী। (পরমাহ্লাদে)

এতকালে প্রজাপতি হলো অনুকূল।
ফুটিল তোদের বুঝি বিবাহের ফুল ॥

জাহ্নবী। ও মা, কি বল্লি?

শাম্ভবী। ও মা, বুঝ্‌তে পাল্যাম না।

কামিনী। ও মা, কি বল্‌লে মা, আবার বল, বল বল

ব্রাহ্মণী। ওগো, তোদের 'বে' হবে গো, 'বে' হবে?

জাহ্নবী। (সবিষাদে)

জাহ্নবী যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট।
পাইবে সুন্দর বর সুন্দরের কাট ॥
বরযাত্র তাহে মাত্র যমরাজ দূত।
বাসর শয়নসুখ হবে অনুভূত ॥

শাম্ভবী। (আশ্চর্য্যান্বিতা)

শাম্ভবীর 'বে' এযে অসম্ভব কথা।
কুলীন কুমারী মোরা 'বর' পাব কোথা ॥
বল্লাল বিহিত কুল অকূল সলিলে।
পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা মিলে ॥

কামিনী। (সোৎসুকা)

কি বল্লি কি বল্লি মা গো সত্য করি বল।
শুনিয়া এ শুভ কথা হয়েছি চঞ্চল ॥

কোথা বর বাসা কোথা এসেছে কি বর।
কবে হবে আজি নাকি বল গো সত্বর॥
বরের বয়স কতো দেখিতে কেমন।
যাহৌক্ হলেই হয় এই আকিঞ্চন॥

ব্রাহ্মণী। হবে গো হবে, আজ্ হবে, আমি মিছা কথা কৈনে।

জাহ্নবী। ও মা, আমার আর 'বে' হলে কি হবে মা? আমিতো যৌবনে জলাঞ্জলি দিচি, আর কত কালইবা বাঁচবো, কেন আর বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ?

ব্রাহ্মণী। বাছা, এমন্ কথা বল্তে আচে? কিসের বয়েস্? কচিছেলে, ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস।

শাম্ভবী। মা, আমাদের 'বে' হবে তা বল্লাল তো টের পাবে না?

ব্রাহ্মণী। টের পেলে কি হবে?

শাম্ভবী। (সভ্রূভঙ্গে) টের পেলে সে টের পাওয়াবে; সে এমন নয়, যেমন মোল্লা বলে "হেঁদুর পরব্ নাই" তেম্নি বল্লাল বলে "কুলীন বামণের মেয়ের কপালে 'বে' নাই," তা দেখিস্, সাবধান২।

ব্রাহ্মণী। বাছা, এখন কি বল্লাল আছে? সে যে অনেক দিন মরেচে।

শাম্ভবী। সে মলে কি হবে মা? তাচ্চেয়ে তার চেলা বড়, তারা মেলা বেড়াচ্চে, দেখিস্।

ব্রাহ্মণী। তোদের ভয় কি মা? আমি কুল রক্ষা কর্ব্যো, কুলীন বর এসেচে।

শাম্ভবী। (সবিষাদে) ওমা তুই কি কুল রক্ষা কর্ব্যি, তবে জাত রক্ষা কে কর্ব্যে মা?

ব্রাহ্মণী। (অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওমা শাম্ভবি তোর এ কথার উত্তর কি দিব? তার নিমিত্তে আমি বলে ছিলাম গো, বলে ছিলাম সেই মিন্সেরে, বলি "হেদে, ভাল বর দেখে মেয়ে গুলোর বে দিস্," তা বাছা, আমি বলো কি হবে? সে 'কুল' খোঁজে, বলে 'কুল থাক্লেই সব থাকে'। আরো দেক্, মেয়েদের জাত রক্ষা প্রথমে, মা বাপ করে; মা বাপ না করিলে, রাজা; রাজাও যদি জাত রক্ষা না করে, তবে বিধাতা আপনিই রক্ষা করেন্। তা বাছা, তোদের তারা কুলের গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে! এখনকার যে রাজা তিনি আবার প্রজার ধর্ম্মে হাত দেন না, অভাগ্যি আরকি! পূর্ব্বে এক রাজা ছিল তার নাম 'বল্লাল' সে মিন্‌সে সকলের জাত নষ্ট কর্ত্যেই এই কাল কুলের

সৃষ্টি করেচে, আব আমাদের জাত যায় বিধাতারও এ ইচ্ছে, সেইতো ঐ জন্তে বল্লালে মিন্‌সেকে রাজ্য দেয়, তবে মা বাপ, রাজা, ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাত নষ্ট কত্যে বসেচে তখন জাতরক্ষা আর কে কর্ব্যে মা? শাম্ভবী, ক্ষামা কর, 'জাত-রক্ষার কায নাই, কুলরক্ষায় সম্মত' হ। আবার কেন নিশ্বাস ফেলে অধোমুখে রহিলি? কি কর্ব্যো, মনোদুঃখ করিস্ নি। বাছা কামিনি, তুই যে কোনকথা কচ্চিস্ নে?

কামিনী। না মা, তোর কথায় আর বিশ্বেস নেই, তুই এমন করে আমায় কতোবার ভুলিয়েচিস্।

ওমা আর ভুলাইলে কি হবে তা বল।
কাপড ঢাকাতে কোথা থাকেগো অনল ॥
যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি।
একেত অবলা বালা তাহে কুলনারী ॥
কি ফল বিফলে গেল যৌবন বহিয়ে।
কত পাপে হইয়াছি কুলীনের মেয়ে ॥
লাজ আসে একথা কহিতে তোর কাছে।
কান্ত বিনে কেমনে বসন্তে প্রাণ বাঁচে ॥
বসন্ত অশান্ত বড দুরন্ত নিতান্ত।
বিরহি বধিতে বুঝি হইল কৃতান্ত ॥
ফুটিল বিরহিমন ফুটিল বকুল।
জুটিল মধুপাবলি হইয়া ব্যাকুল ॥
ছুটিল কন্দর্প বাণ কুটিল গমন।
ঘটিল বিপদ বড লুটিল ভুবন ॥
জরজর হলো তনু কোকিলের রবে।
কেমনে এমন কালে জাতি কুল রবে ॥
আমুল মুকুল সুশোভিত সহকার।
সহকার হয় আসি মদন রাজার ॥
কামির হৃদয় রাজ্য কার অধিকার।
অধিকার বাঞ্ছা করে শান্তি নাই তার ॥
এমন দুরন্ত কালে জ্বলি কামানলে।
তিনকুলে কেই নাই দুটো কথা বলে ॥

সহিতে না পারি আর কর গো উপায়।
কতকাল ভুলাইয়া রাখিবি আমায় ॥

ব্রাহ্মণী। না মা, এবার মিছা নয়, সত্যি, গো সত্যি।

কামিনী। ও মা, সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে? বাসা দিছিস্ কোথায় মা? চুপি২ দেকতে গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা?

ব্রাহ্মণী। না বাছা, শুভ দৃষ্টি হয নেই, এখন কি দেকতে আচে? পরে দেক্‌বি, এত উথলা হইস্ নে, তোদের ছোটো বোন্ আদরিণী কিশরী কোথায় রে?

কামিনী। সে রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণ সঙ্গে পূবপাড়ায় খেল্‌তে গেচে এখনো আসে নাই।

ব্রাহ্মণী। একবার ডাক দেখি বাছা তাকে।

কামিনী। (পূর্ব্বমুখে,) ওওও কিশরীইইই, কিশোরীরেএএএ। না মা, সে ডাক্ শুন্‌লেনা, তাব এখন কাযনি আমারই আগে হৌক্, তার পর তবে তার হবে।

ব্রাহ্মণী। আঃ বাছা, ডাক আর একবার, ছোট ভগ্নী হয়।

কামিনী। (পুনর্ব্বার চীৎকার স্বরে) ওওও কিশোরী-ইইই, কিশরীরে এএএ পোড়ারমুখী, শীঘ্রি আয়।

[কিশোরীর প্রবেশ]

কিশোরী। (সোৎসুকা)

প্রফুল্ল বকুল ফুল, গন্ধে অন্ধ অলিকুল,
অনুকূল মলয় পবন।
প্রবোধ না মানে মন; সদা করে আকিঞ্চন,
বল্লালির দিতে বিসর্জ্জন।
কুলে কালি দিয়ে কালী বলে চলে যাব কালি,
ঘটকালী কি করিবে আর।
যৌবন অমূল্য ধন, করিব গে বিতরণ,
নাহি ভয় থাকিবে কাহার ॥

কে রে আমায় ডাক্‌লে?

কামিনী। মা ডাক্‌চে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাক্‌লি?

ব্রাহ্মণী। তুই কালিঅবধি কোথায় বে ? দেকতে পাইনে কেন ?

কিশোরী। ও মা ও মা, আমি ও পাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেলতে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর এমন্ যেযোনা, ডাগোর ডোগোর মেয়ে, যেতে আছে ? লোকে যে নিন্দে কর্ব্বে, ছি !

কিশোরী। ও মা, কেন নিন্দে কর্ব্বে মা ? কর্ব্বোনা, ওহে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর যেযোনা, আজি এক কর্ম্ম আছে।

কিশোরী। কি কর্ম্ম মা ?

ব্রাহ্মণী। বাছা, আজি আমাদের বাড়িতে এক শুভ কর্ম্ম হবে।

কিশোরী। ওমা, কি শুভ কর্ম্ম, বল্না মা ? হে মা কি শুভ কর্ম্ম ; বলবিনে২ ?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বল্বো না কেন ? আজি তোদের 'বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) ও মা, 'বে' কাকে বলে মা ?

ব্রাহ্মণী। 'বে' কাকে বলে তাও জানিস্ নে বাছা ? 'প্রধান সংস্কার'।

কিশোরী। ও মা, তাকি আমি খাব ?

ব্রাহ্মণী। বাছা 'বে' কি খেতে হয় ? বাভাবর আস্বে, তোদের 'বে' কর্ব্বে কতো ঘটাঘটি হবে, সেকি বাছা কিছুই জানিস্নে ?

কিশোরী। হ্যাঁ২, সেই 'বে' তা আমি জানি, তা কার হবে মা ?

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ও মা, তবে তোর হবে না ?

কিশোরী। (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই, তাকি বল্তে আছে ? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হ্যাঁ, হুঁ, বুঝিচি, তোর হয়ে গেছে। ও মা কার সঙ্গে হয়েচে, বল্না মা ?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আমায় ব্যস্ত করিস্ নে, মর্চ্চি নানান জালা, তোরা সকলে এখন বাড়িতে যা। [কন্যাগণের প্রস্থান]

আমি যাই, আর দাঁড়াব না, পাড়ার মেয়েদের বল্তে হবে, বেলা হলো ; আমি যা না কর্ব্বো তা হবে না।

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান]

[রসিকার প্রবেশ]

রসিকা। (স্বগত)।

বাড়ি মোর বংশীপুরে, দেখা যায় কিছু দূরে
ঘেরাঘোরা ঘর দুই খানি।
নবীন যুবতী আমি, মরেছে আমার স্বামী
তবু কভু দুঃখ নাহি জানি॥
জাতিতে নাপিত বটে, খাছে নানা গুণ ঘটে,
আলতাকামান মোর কর্ম্ম'।
করি নাই কোন পুণ্য, তথাপি পাতক শূন্য,
অতিথি না ফেরে এই ধর্ম্ম'॥
তৃষিত পথিক গণ, এসে করে আকিঞ্চন,
যদি পায় মোর ঘরে বাসা
নাই যায় অন্য স্থান, করে সবে অবস্থান,
এমন আমার ভালবাসা॥
কিছু নাই অন্য জ্বালা, এক মাত্র পেট টালা,
দিবসেতে পাড়ায় কামাই।
ভালবাসে সবে অতি, আমি শুদ্ধমতী সতী,
রজনীতে নাহিক কামাই॥
বায়সের গতি নাই, তাইতো পাড়ায় যাই,
পোড়া পেট পুরাবার আশে।
বসিয়া না পাই খেতে, সেই হেতু হয় যেতে
সে থাকিলে কেটা আর আসে॥
কেহ নাই পরিজন, একাকী না টেকে মন,
মনের মানুষ যদি পাই।
খুলে সব বলি তায়, যদি দয়া করে তায়,
তবে তার সঙ্গে চলে যাই॥

(**গাত্রভঙ্গ করিয়া**) যাই আবার ওবাড়িতে।

[দেবলের প্রবেশ]

দেবল। কে ও, নাপ্‌তেণী নাকি?

রসিকা। হ্যাঁ ঠাকুরপো, আমিই বটে।

দেবল। তবে এখন দেক্‌তে পাইনে কেন ?

রসিকা। আর ভাই, দেক্‌তে পার না তা দেক্‌তে পাবে কি ? দেক্‌তে পাত্তে তবে অবিশ্যিই দেক্‌তে পেতে।

দেবল। (সহাস্যমুখে) নাপ্‌তেবৌ, তোমাকে দেক্‌তে পারে না এমন লোক কে ?

রসিকা। সেকি ভাই, কি বল্যে ? সকলে কি সকলকে দেক্‌তে পারে ?

কমল কোমল ফুল, মধুদানে অনুকূল,
দশদিক করে আমোদিত।
পরাগে পরম শোভা, মধুকর মনোলোভা,
হেরি যাহে চক্ষু চমকিত ॥
দোষাকর নিশাকর, লোকে কহে সুখাকর,
দুঃখাকর বলি আমি তাকে।
কুমুদে আমোদ মানে, গুণ দোষ নাহি জানে,
সে পদ্মেতে শত্রু ভাব রাখে ॥

শুন্‌লে ঠাকুরপো ?

দেবল। হাঁ শুন্‌লেম্‌ বটে, কিন্তু চন্দ্র তো পদ্মিনীকে কখন দেখে নাই ; যদি একবার দেক্‌তে পেতো তবে বলতে পাত্তে।

রসিকা। ভাল ভাই, চন্দ্র পদ্মিনীকে দেখে নাই বটে ; যা বল্যে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি "রত্ন কি আপনিই লোকের নিকটে আসে, না লোক যত্ন করে রত্নের অন্বেষণ করে ?

দেবল। "লোকেই অন্বেষণ করে, রত্ন আবার কোথা কাকে তত্ত্ব করে থাকে ?"

রসিকা। তবে ভাই, দেখ দেখি "যদি চন্দ্র যত্ন করে তবে কি পদ্মিনীকে দেখতে পায় না ? অবিশ্যি পায়, তা না করাতে তারি দোষ প্রকাশ"।

দেবল। ফল বটে, যথার্থ, তাইতো লোকে চন্দ্রকে কলঙ্কী কহে।

রসিকা। হা ঠাকুরপো, এখন পথে এসো, বল্‌তে পারি কি না ?

দেবল। (হাস্য মুখে) নাপ্‌তেবৌ, তোমায় কথায় পারা ভার।

রসিকা। (হাস্য মুখে) ঐ 'ভার' বলে তো কেহ কথা কয় না।

দেবল। এখন আছতো ভাল ?

রসিকা। আর ভাই আছি, ভাল না থেকেই বা করিকি ?

দেবল। তাই বলি, পরামাণিক দাদা নাই, তোমার চলে কিসে ?

রসিকা। চলবার ভাবনা কি ভাই, আমার যে 'এক চুপড়ি' আছে তাতেই চালাই, আপনি না চালালে কে চালাবে বল ?

দেবল। এখন কোথা যাচ্চ ?

রসিকা। এই সব কামাতে যাচ্চি ভাই।

দেবল। (পরিহাস পূর্ব্বক) তুমি কি 'সব' কামিয়া থাক ?

রসিকা। (হাস্য মুখে) না ভাই তা নয়, আজ বাঁড়ুয্যের বাড়িতে 'বে', পাড়ার মেয়েরা জলসৈতে যাবে, তা কামিয়েজুমিয়ে না দিলে কি হবে ?

দেবল। উত্তর পাড়ার হয়েছে ?

রসিকা। হাঁ, তাদ্দের কামিয়ে এই আস্চি।

দেবল। তারা এখন কি কচ্চে, পূজার উদ্যোগ কচ্চে কি ?

রসিকা। আজি পুজো মাথার উপর থাক্, পূজোর যো করবে কি সে যো নাই, তারা যে ব্যস্ত।

দেবল। ব্যস্ত কেন ?

রসিকা। জলসৈতে যাবে, সাজ গোজ কচ্চে।

দেবল। সাজগোজ আবার কেমন ?

রসিকা। তা শুনবে ?

কুলপালকের গৃহে বিবাহ উৎসবে।
প্রতিবাসি রামাগণ নিমন্ত্রিত সবে॥
মনোমত সজ্জাকরে বিভবানুসারে।
এই প্রথা সর্ব্বকালে সকলি সংসারে॥
মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা।
কর্ণমূলে পরিল স্বর্ণ কাণবালা॥
কেহ কেরাপাত পরে কেহবা চৌদানী।
নাছিল পূর্ব্বেতে ইহা হয়েছে ইদানী॥
শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল।
হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল॥
ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণাস্থিতি।
যাহা হেরি যুবজন গণের বিস্মৃতি॥
মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা।
বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা॥

কেহ করে পরে দিব্য সুবর্ণ বলয়।
তড়িতে জড়িত যেন নব কিসলয়॥
বাহুতে ধারণ করে কেহবা কেয়ুর।
হেরি সৌদামিনী বোধে হর্ষিত ময়ূর॥
কেহ কণ্ঠে পরে ডায়মোন্ কাটা চিক্।
দেখিতে অপূর্ব্ব যাহা করে চিক্‌চিক্॥
পরিল গলেতে কেহ মণিময় হার।
অম্বরে সম্বৃত তবু বাহিরে বাহার॥
রত্নের অঙ্গরী কেহ যত্ন করে পরে।
আপন সম্পদ কিছু দেখাইতে পরে॥
কোন নারী নিতম্বে ধারিল চন্দ্রহার।
বিরহি যুবার মন করিতে সংহার॥
কাহার চরণে ঢেয়ুস্করঙ্গের মল।
রজত নির্মিত যাহা অতি সুনির্ম্মল॥
কেহবা খোপার মাঝে গুঁজিয়া গোলাপ।
কোকিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে করিছে আলাপ॥
করিয়া সুসজ্জা সবে আনন্দিত মন।
বিবাহবাটীতে দেখ করিছে গমন॥

ঠাকুরপো আমি এখন যাই, বাকজুকি এই সময় চুকাই গে।

দেবল। হাঁ, আমিও ঘরে যাই. এখন পুজো কর্ত্তে যাওয়া হলো না।

[উভয়ের প্রস্থান]

[কামিনীগণের প্রবেশ]

মোহিনী। এই তে বে বাড়, কৈ কে কোথা গো? কাকেও যে দেক্‌তে পাইনে। ও মা সেএ কি গো? যে কথায় বলে "যার বে তার মনে নাই, কাটুনা কামাই পাড়া পড়সীর"।

ভামিনী। মরণ্, ও কি হলো? মিল্লো কৈ লো?

মোহিনী। আর ভাই, মেলে কৈ?

ভামিনী। গুণ থাক্‌লেই মেলে, "যার বে তার মনে নাই, পাড়াপড়্‌সীর ঘুম নাই"। দেক্‌দেকি মিল্লো কি না?'

মোহিনী। ভাল ভাই, তাই যেন মিল্লো, এখন বে বাড়ির কাকে ও যে মেলে না, তাব কি বল্না?

যমুনা। বলে মন্দ নয়, বে বাড়ি, অচ্চ কিছুই দেক্‌তে পাই নে। বাদ্যি নেই, বাজ্না নেই, কিছুই নেই; সেকি, আঁ, ওমা আমি কোথা যাব, ওমা আমি কোথায় যাব!

হেমলতা। এই যে ভাই একটা কলাগাচ রয়েচে।

যমুনা। অমন কত গাচ কত দিকে আচে, আসল কই লো? বাড়িলোক কৈ?

[ব্রাহ্মণীর প্রবেশ]

ব্রাহ্মণী। (প্রফুল্ল মুখে) এই যে মা সকল, দিদি সকল, বাছা সকল, এসেচো এস২, আসবে বৈ কি; তোমাদের কর্ম্ম, কর্ব্বো কর্ম্মালে, খাবে খাওয়াবে, নেবে থোবে; তোমরা না কল্যে কে কর্ব্বে? জ্ঞাতিবল, গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা।

হেমলতা। ওলো ঠান্‌দিদি, বলি এ কি লো? মেয়েদের বে দিতে বসেছিস্ তা সব ফাকিজুকি, ঘটাঘাটি কৈ, কিছুই যে দেখিনে?

ব্রাহ্মণী। আর ভাই 'ঘটা', কুলীনের মেয়ের 'বে' ঘটাই ভার, আবার 'ঘটা' পাবো কোথা বোন্? তবে তোরা এসেছিস্ এই ঘটাই 'ঘটা'।

কামিনী। ওলো হেমলতা, জানিস্‌নে বড গিন্নির সব ফাঁক, নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন?

ব্রাহ্মণী। দূর ছুঁড়ি, ওকথা কি বল্‌তে আচে? জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি? যা, তোরা সকলে মিলেজুলে জলসৈতে যা দেখি?

চপলা। যে তোর মেয়েদের বর এসেচে।

[বাটী মধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রস্থান]

তার জন্যে জলসৈতে হবে না, তাকে 'জল সৈ কল্লিই' ভাল হয়—শুনে গেলিনে মাগ?

চঞ্চলা। ওলো কুলবালা কুলো নে লো মাথে করি জল সহিবারে সবে বল 'হরি হরি'।

সুলোচনা। মরণ, ও কি লো? শুভ কর্ম্মে অমঙ্গলে কথা?

চঞ্চলা। না ভাই, যে 'বর' এসেচে তারপক্ষে এ অমঙ্গলে নয়।

সুলোচনা। কেন? কেমন বর বল্না শুনি?

চঞ্চলা। শোন্‌না ভাই ওদের মুখে, তবেই বিশ্বেস্ হবে।

সুলোচনা। ওলো চপলা, বল্না লো কেমন বর?

চপলা। (সবিষাদে)

আহা মার আই২, সখি একি শুন্তে পাই,
বর নাকি বায়াত্তুরে বুড়ো।
কপাল নিতান্ত পোড়া, কোথা হতে এলো মড়া,
ঘটাইল ঘটক আঁটকুড়ো॥

সুলোচনা। বুড়োবর? এতো ভাল, মন্দ কি? আমার যেমন কপা৹ তাতো নয়?

চঞ্চলা। তোর আবার কপাল মন্দ কেমন লো, বল্‌না?

সুলোচনা। তবে শোন্

কি জানিবি ওলো ধনি, এ বর মাথার মণি,
মোর পতি দেখে বুক ফাটে।
বয়স খতালে পর, নাতি ভেবে এসে জ্বর,
কোলশোভা হয়ে রাত কাটে॥
এপতি মাথার চুড়া, বুড়াতো রসের গুঁড়া,
কাছে থাকে তবু শোভা হয়।
সে যে অতি শিশু ছেলে, কেঁদে উঠে ভয় পেলে,
শান্ত করি রাখি তবে রয়॥

চন্দ্রমুখী। (সবিষাদে) তবে আমিও বলি, লোকের কাচে বলোও কতক নিবিত্তি হয়। ভাই সে তো তোর মন্দ নয়, কখন কাযে লাগ্‌বে, আমার শুন্‌বি?

পতির রমণী গণ, কিছু কম একপণ,
তবু বিয়া করে পেলে চাকি।
যৌবন বিফলে যায়, বারেক না দেখি তায়,
জীয়ন্তে মরার কিবা বাকি॥
আসিবেক করি আশ, তাহার বিবাহ চাস,
মাসমাস ফেরে নানা দেশ।
ব্যবহার দিতে নারি, তাই মোরে বিভা করি,
স্বপনেও নাকরে উদ্দেশ॥

যমুনা (ঈষৎ ক্রোধে)

আমি কি বলিব বাণী, প্রাচীনা সভার মানি,
অভিমানি কথায়২।

বয়স হইল যাট, বিবাহের নাই পাট,
আছে কাট শেষের উপায় ॥
বাপের প্রধান ঘর, নাই মেলে যোগ্য বর,
কুলের বড়ই আঁটাআঁটি।
মনে সদা এই চাই, বাহির হইয়া যাই,
পড়ে কুলে কালি পরিপাটি ॥
আইবুড়ো থেকে মোর, বয়স হইল ভোর.
মুড়ো দিই মুখে বল্লালের।
বহু শিব পূজা গুণে, জন্ম গেল মনাগুণে,
কপালে আগুণ সে হরের ॥

হেমলতা। (হাস্যমুখে) ভাই আমারও সেই রূপ।
যৌবন দুঃসহ ভার, সহিতে না পারি আর,
এ শরীরে কত জ্বালা সয়।
বয়স্ হইল বিশ, ইচ্ছা হয় খাই বিষ,
মনে মনে কতো রোষ হয় ॥
বিয়ার নাহি প্রসঙ্গ, অনঙ্গেতে জরে অঙ্গ,
রঙ্গ দেখি লোকে ব্যঙ্গ করে।
মনেতে ভেবেছি সার, শুধিব বল্লালি ধার,
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে ॥

যশোদা। ওলো "তোদের দুখ শুনে মোর বুক ফাটে, তোরা খাসি জাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে"। তোরা ছেলে মানুষ, তোদের কাচে বলা নয়, যদি বলি, তবে শোন্, আমার কথা শুন্‌লেই তোদের দুঃখ দূর হবে।
ভগিনী আমার ছয়, আমারে নে সাত হয়,
সবার বিবাহ এক দিনে।
কি কব বরের কথা, মনে হলে মর্ম্ম ব্যথা,
এই হেতু কহিতে পারিনে ॥
তার বয়সের সম, পাহাড় পর্ব্ব'ত কম,
আছে কিনা ভুবন ভিতরে।
উহার চরম কালে, বন্ধুরা না ফেলে খালে,
গঙ্গাতীরে আনিল সত্বরে ॥

পাইয়া অযোগ্য বর, বরি মোরা সেই বর,
অতঃপর সে পায় পঞ্চত্ব।
তখনি বৈধব্য দশা, প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা,
কিবা কব কুলের মহত্ত্ব ॥
বল্লাল হইয়া কাল, দিয়াছে কুলের শাল,
সামাল২ ডাক ছাড়ি।
না হলো বাসনা পূর্ণ, কেবল বৈধব্য তূর্ণ
মন্ত্রের প্রভাবে উদ্যম বাঁড়ি ॥
কোথায় মঙ্গলধ্বনি, করিবেক যত ধনী,
হরিধ্বনি হইল তথায়।
শঙ্খ বাদ্য যেথা খাটে, তথা মহাশঙ্খ ফাটে,
বুকফাটে মরি হায়২ ॥
পতির করিয়া গতি, পরে নিকেতনে গতি,
দুর্গতির নাহি হলো শেষ।
কোথা ছিল একাদশী, আসিয়া পাইল বসি,
সর্ব্বনাশী নাহি ছাড়ে দেশ ॥

তা বলে আর কি হবে? আমি সে সকল পাকে পুঁতিছি, সে কথায় আর কায নাই, দূরহোগ্‌গে, যা তোরা যাজ্জন্যে এসেছিস্ যা, জলসৈতে যা।

বিজয়া। বড়দিদি, তুই যাবি নে?

যশোদা। ভাই আমি গে কি কর্ব্বো? রাঁড মানুষ, ছোঁব না, নেপবো না।

বিজয়া। আচ্ছা চল্‌লো তবে আমরাই যাই।

চপলা। (উলু২ শব্দ করিয়া) বাজানা লো, শাঁক্‌টা।

চঞ্চলা। (শঙ্খবাদ্য করিয়া) বরগুলা কোথা লো?

কামিনী। চাইতে গিছিলাম্ তা বড়গিন্নী বল্যে "এখন হয় নি, দিচ্চি এই সাজিয়ে গুজিয়ে, দাঁড়া এটু।"

মোহিনী। ওলো, বড়গিন্নী আপনার বেলা বুজ্‌তে, মেয়েদের বেলা তার বেলা হয় না, না হোগ্‌গে।

হেমলতা। এই নে লো, 'শ্রী' নে।

ভামিনী। (করতালি দিয়া) ওমা-আমি-কোথা-যাবো! এই কি 'শ্রী'।

চপলা। নে বেনে, যেমন বরের 'শ্রী' তেমনি শ্রীরও 'শ্রী', সকল বিশ্রী কাণ্ড,

তবে শ্রীর কি সুশ্রী হবে? চল্ চল্ আবার ঘরকন্না আছে শীঘ্রি২ জলসৈয়ে আসিগে।

[কামিনী গণের জল সহিতে প্রস্থান।]

যশোদা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, স্বগত) এই যে সকলেই গেল। যাবে না কেন? ঈশ্বর যেতে দিচ্চেন তাই যাচ্চে! আমি যে আহ্লাদ-আমোদ করবো তারতো যো নেই। যাই ঘরে যাই, এখানে দাঁড়িয়ে আর কি করবো। (কিঞ্চিৎ গিয়া) এই যে ফুলকুমারী আস্চে, যাবে বুঝি জলসৈতে।

ফুলকুমারী (কিঞ্চিদ্দূর হইতে)। দাড়া গো, ঠানদিদি দাড়া।

[ফুল কুমারীর প্রবেশ]

যশোদা। কি লো, নাত্‌নি? সব মেয়েরা জলসৈতে গেছে তোর এতো বেলা কেন্‌লো? কালি বুঝি নাতজামাই এসেছিল তাই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলি—এই যে দুই চোক লালকরে বসেছিস, সেকি লো? বড় খিদে হলে কি দুহাতে খেতে হয়?

ফুলকুমারী (সবিষাদে)

বোলোনা ঠান্‌দিদি আর সে কথা বোলোনা।
জ্বলন্ত অনলে মোর আহুতি দিয়োনা॥
কালামুখো বিধি ভাল মিলাইল ভালে।
এসে ছিল বটে সেটা কালি সন্ধ্যাকালে॥

দিদি সে কথা আর বলিস্ নে। জ্বলে পুড়ে মচ্চি আবার তুই কেন জ্বালাস? গোড়েচ্চাণ্ড কি স্বর্গ দেখে? তেমন কপাল হলে কি কাল কুলীনের হাতে পড়িতাম? আমাদের যেমন কপাল তেমনি মিলেছে! তা ও কথায় আর কাম নাই।

যশোদা। (মুখ ফিরাইয়া) মরণ্‌গে বল্লিইবা খেতি কি? আমিতো ও রসে বঞ্চিত, তা পরের কথা শুন্তেও নেই? নেই২ বল্লিনে, নাই বল! (অভিমান)

ফুল। না ঠান্‌দিদি, তা না, তোকে বলিনে কেন, বলি বল্লিই তোর দুঃখ হবে. নাতনীর করিস্।

যশোদা। আমাদের যখন যে দুঃখ হয় সম্পর্ক বুঝে বলে থাকি—বল্লিই ভাল যত মনে রাকবি ততই মন্দ, বলে ফেল্যে মন খোলসা পায়—তা বলিস তো বল, কি রকম এলো, কি কল্যে?

ফুল। তবে শোন্ ঠান্‌দিদি।

কাপোড় কাচিতে গিয়া সমাচার পাই।
লোকে বলে আসিতেছে ওদের জামাই॥

সে কথা শুনিয়া ভাষি সুখের সাগরে।
পথ না দেখিতে পাই আনন্দের ভরে ॥
থাকিল কাপড় কাচা সত্বর বাড়িতে।
আসি পথে কত ভাব ভাবিতে২ ॥
বহুদিন পরে নাথ আসিল ভবনে।
সাধিব মনের সাধ যত আছে মনে ॥
ভবনে সে পূর্ণ শশি দেখিয়া উদিত।
নয়ন চকোর মোর হবে হরষিত ॥
উথলিবে প্রেম সিন্ধু সুখের সঞ্চার।
দূরে যাবে দুঃখময় মহা অন্ধকার ॥
মানস কুমুদ ফুটে হইবে প্রকাশ।
নির্ম্মল হইবে তবে হৃদয় আকাশ ॥
বিরহ ব্রতের আজ উদ্যাপন করে।
যৌবন দক্ষিণা দিব গিয়া তার করে ॥
মনোমত বেশ করি নিকটে যাইব।
প্রথমে বাড়াতে মান মান প্রকাশিব ॥
কাঁদাব ধরাব পায়ে নাহি অনুরোধ।
পেয়েছি যতেক দুঃখ তার পরিশোধ ॥
পরেতো কহিব কথা বদন তুলিয়া।
একেবারে ভুলাইব নয়ন ঠেরিয়া ॥
বড় যত্নে শিখিয়াছি যতো কাব্যরস।
কহিলে তাহার কাছে হইবে সুরস ॥
মন্মথেরে মনোমত শিখাব তখন।
কোথা পালাইবে মোরে করে জ্বালাতন
দুরন্ত বসন্ত সখা সামন্ত সহিত।
নিতান্ত প্রাণান্ত সম করেছে অহিত ॥
বিহিত করিব তার করিয়াছি মনে।
কি করিবে আর মোরে মলয় পবনে ॥
কোথায় থাকিবে সেই কাল পিকবর।
কোথাবা রহিবে দুষ্ট ভ্রমরী ভ্রমর ॥

এইরূপ অহঙ্কার মনে২ করে।
গৌরবে গর্ব্বিণী বড় আসিলাম ঘরে ॥

ভাই তারপর তার রঙ্গ দেখে 'হরিভক্তি উড়ে গেল'!

যশোদা। কেন্‌লো, কি হলো বল্ দেখি শুনি?

ফুল। (সংক্ষেপে)

ব্যস্তসমস্ত হলো সবে জামাই দেখিয়া।
বাহিরে বসিতে দিল গালিচা পাতিয়া ॥
ধর্ম্মভঙ্গ পণে কহে সবা বিদ্যমানে।
ব্যাভার পাইলে তবে পাধোবো এখানে' ॥
শুনিয়া জননী মোর বড়ই দুঃখিনী।
খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু আনিল আপনি ॥
টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তাকে দিল।
এমনি কুলের ধর্ম্ম তবে পা ধুইল ॥
অল্প হলো বলে তবু মুখ ঘুরাইয়া।
কহিল দুর্ব্বাক্য কতো বাটালি কাটিয়া ॥
জলপান সহ পান সাজায়ে পাঠাই।
সে এমন্ তার মন তবু পেতে নাই ॥
জামায়ের আগমনে জননী তৎপর:
খাদ্যদ্রব্য আয়োজন করিলা বিস্তর ॥
যতন করিয়া দিদি বাড়িলেন ভাত।
দাদা গিয়া আনিলেন ধরে তার হাত ॥
পেতে দিল বড় পিঁড়ি তাহায় বসিয়া।
ইহা খায় উহা ফেলে নবাবি করিয়া ॥
অতঃপর বলিতে আমার বুক ফাটে।
সে পারে বলিতে যেবা দড় আটেকাটে ॥
যামিনীতে একাকিনী শয়ন করিয়া।
পতির ধ্যানেতে আছি নয়ন মুদিয়া ॥
কতক্ষণে প্রাণনাথ আসিবেন কাছে।
কহিব সকল দুঃখ যত মনে আছে ॥

মনে২ এই রূপ বাসনা করিয়া।
কপট নিদ্রায় আছি নয়ন মুদিয়া ॥
কিছু পরে আসিলেন মোর প্রাণ কান্ত।
তা হেরে অমনি হই মানিনী নিতান্ত ॥
দেখিয়া নিদ্রিতা মোরে পাষণ্ড পামর।
অনায়াসে ঢ্যাকামেরে জাগায় সত্বর ॥
ইথে অভিমান আর ক্রোধ উপজিল।
তবু সে বেহায়া মিন্‌ষে কহিতে লাগিল
শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।
নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি ॥
একথায় যদি মানভরে আমি থাকি।
ভাবিলাম চলে যাবে দিয়া মোরে ফাঁক
কত স্তব বিনয় করিয়া ধরি কর।
তবু সে দুর্বাক্যবিষে করে জরজর ॥
শপথ করিনু কতো সুপথে আনিতে
কুপথিক কোথা পায় সুপথ দেখিতে ॥
অবশেষে এই যুক্তি মনে করে স্থির।
কাটনাকাটা কড়ি যত করিনু বাহির।
যা ছিল আমার পুঁজি দিলাম সকল।
তথাপি অধিক দেও কহিল পাগল ॥
তাতে কহিলাম নাথ তুমি জ্ঞানবান
কেন কর অধীনীরে এত অপমান ॥
কহ দেখি কোথা আছে বিধান এমন
পত্নীর নিকটে পতি লইবে বেতন ॥
ইহা শুনি গুণমণি ক্রোধেতে মহেশ।
নারী হয়ে মোরে তুমি দেও উপদেশ ॥
এত বলি ক্রোধভরে উঠিয়া চলিল।
বাবার টোলেতে গিয়া বিটোল শুইল ॥
দরমা পাতিয়া তথা করিল শয়ন।
মশাতে চাসাকে শিক্ষা দিল বিলক্ষণ।

প্রভাতে চলিয়া গেল করে অতি রোষ।
অমৃতে উঠিল বিষ কপালেরি দোষ ॥
যত আশা মনে ছিল সব গেল দূর।
দর্পচূর্ণ করি মোর গেল সে নিষ্ঠুর ॥
মম সম অভাগিনী আছে কোন দেশে।
হাতে দিয়ে নিধি বিধি হরে নিল শেষে ॥
একাকিনী বিরহিণী যামিনী জাগিয়া।
নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥

যশোদা। নাতনি আর বলিস্ নে—বলিস্নে, বুক ফেটে যায় !!! (সজল নয়নে) হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি ? কে তোকে কুলের সৃষ্টি কত্যে বলে ছিল ? কুলতো নয় এ কুলের আঁটি—বড় কঠিন ! যার কুল আছে তার কি দয়া নেই ? ধর্ম্ম নেই ? কর্ম্ম নেই ? আহা ! আহা ! কিদুঃখু ! নাতনি তুই আর কাঁদিস্নে। মেয়েদের সঙ্গে যা ; আবার আস্বে, ভাব্না কি ? রাগ করে গেচে কি কর্ব্বি ? এবারশুদ্ধো এই অব্দি কাট্‌নাটা মাটনাটা কেটে কিছু হাতে করে রাখ্।

—তবু কাঁদ্দে লাগ্‌লি ? আহা ছেলে মানুষ ! বেনে কি কর্ব্বি তা বল ? এই দেক্‌দেখি আমরা কি কচ্চি, তো তো আছে আমার যে নেই—তা কি কবো ?

ফুল। (চক্ষুর জল মুছিয়া) ঠান্‌দিদি, এ থাকাচেয়ে না থাকা ভাল ! না থাক্‌লে মনে প্রবোদ্দেওয়া যায়, এ থেকে নেই ! একি সামান্যি দুঃখু ? ঐ যে কথায় বলে "দুষ্ট গরু থাকাচেয়ে শূণ্‌গোল ভাল" ॥

যশোদা। (হাস্যমুখে) ওকথা বল্‌তে আছে ? খাড়ু-গাচটা হাতে আছে তবু ভাল। আর সে নাত্জামাই শালাও আবার এই ফিরে আসে, রাগ্ করে কদ্দিন থাক্‌তে পার্ব্বে ? (পথে একটা কুকুর দেখিয়া পরিহাসে) ঐলো নাতনি, ঐ, আবার ফিরে আস্চে।

ফুল। (হাস্য মুখে) ঠান্‌দিদি, তোত্ত নেই, তা লোকে বলে "না পেতে নাত্জামাই ভাতার" তা তুই নে যা।

যশোদা। না ভাই, আমাত্তো নেই বটে, আমি ও-রসে বঞ্চিত, তবে "পরের্ধনে ধোপার নাটে" কাব কি ?

ফুল। ঠান্‌দিদি তোর আবার হয় এই, ও পাড়ায় শুন্‌লেম্ রাঁড়ের 'বে' নাকি চল্‌তি হবে ? তবেই তোর বাড় জলে পল্যো।

যশোদা। (সবিষাদে) আর ভাই, হবে হবেই শুন্চি, হয় কৈ ? আমি থাক্তে

আর হবে ? আমার তেমন অদেষ্ট নয়, মা তোগ্‌গে, আর কাযও নেই। এখন ঘরে যাই ভাই, বেলা হয়েচে।

ফুল। আমিও আসতেম্‌ না, বড়গিন্নীর অনুরোধেই এলেম্‌; আমি বল্যেম জলসৈতে যেতে পারবোনা, তা সে বল্যে "না যাস্‌ না যাবি তুই ঝালিঝাড়া বাট্‌সে" তা যাই, না গেলে ভাল হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

[ভোলার প্রবেশ]

ভোলা। (স্বগত)

মোগাব কোপালে ত্বক নেকেচে গোঁসাই।
খাট্টি২ মরি এট্টু বষ্টি পাই নাই॥
বসি ঘবে প্যাটভরে খাতি নাই পাই।
চাকুরি ঝক্‌মারি কাম করি মুই তাই॥

ঐ ওত্তরের বাড়িয় মুই খ্যানাকাট্টি গেহালাম, এসতে এসতেই বড়মোশাই বল্যে 'ওরে ভোলা, তুই যা, পুরুঠ্‌ঠাকুরেব ডাকি আন", তা এই মুই অদ্দুরে থাকি আলাম্, তামুক খাতিও পালাম্ না, এট্টু জিরুতিও পারলাম না, তাইতো মোদেব বৌ বলেহালো, বলে "চাকুরি না কুকুরি" তা খাতিপত্তি পাইনে না করে কি করবে ? মু নব ঝা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন ? খ্যাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্চি, আগি তবে তামুক খাব। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝাঃ কেচ্চেগানা ভুলি আলাম, দাদাঠাকুর বল্যে "এসবেব বেলা এটা থোঁড়েব গাচ্ আনিস্" তা কিদি কাট্‌বো ? আবার ফিরি যাব ? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পতেদ্ধারে মোর ঝীয়েব ঘব, সেইন্থেই ল্যাবো। (কিয়দ্দুর গিয়া,) এই মোব ঝীয়ের ঘর, এখন ঝী মোর হেত্তা নেই তা বৌন্‌কে ডাকি। (প্রকাশে) ও বৌন্, বৌইন্, একবার তোগার কেচ্চে খান দিবি ? (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁা, কি বলি্য ? হেবিয়ে গেচে ? ঝাক্‌গে, আবার মোরে ফিরি আষ্টে হলো; যাই তবে (অধিক দূব গিয়া স্বগত) ঐ পুরুঠ্‌ঠাকুরের বাড়ি দেক্‌তি পাচ্চি, শালাব বামুণ কদ্দুরে ঘর বেনিয়েচে। (নিকটে গিয়া প্রকাশে) ও পুরুঠ্‌ঠাকুর, ঘবে গো ?—না গো, আব পুরুতঠাকুব বল্‌বোনা, সেবার বলে হেলাম্ তা সে বামুণ কুধ্য করে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও বাবাঠাকুব, বাবাঠাকুর ঘরে গো ? কৈ ওত্তর দেয় না ঝে ? কোথা বুঝি চরাদ্দ কত্তি গেচে। বামুণ্‌দেব কি ? বড় মানুষির বাড়িই ছায়ায় বসি গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ুক তামুক খায়, গপ্পি করে, তাই বুঝি গেচে। ওও মাঠাক্‌রুণ, মাঠাক্‌রুণ, তোমার বাবাঠাকুব কোতা গো ?

[ধর্ম্মশীলের প্রবেশ]

ধর্ম্ম'। (সক্রোধে) আঃ কেরে ও ? রাম২, প্রস্রাব করিতে বসিছি এতো চীৎকার কর্ত্তেছে কেন ?

ভোলা। মুই, বেড়ুযোর বাড়িব মেন্দের—ভোলা ?

ধর্ম্ম'। (সহাস্য মুখে) কিবে ভোলা !

ভোলা। এজ্ঞে হাঁ বাবাঠাকুব, পেন্নাম।

ধর্ম্ম'। কিরে, কেন এসেছিস ? ভালতো সকল ?

ভোলা। এজ্ঞে, বড়মোশাই তোমাবে এস্তে বল্যে, তার মেয়েগার ব্যা।

ধর্ম্ম'। 'বিবাহ !' কি অদ্যই হইবে ?

ভোলা। হাঁ বাবাঠাকুর, আজি সঞ্জেব্যালা ব্যা হবে।

তিনি আমায় বল্যে "ভোলা, তুই আজি নাত্তিরে ঘর যাস্নে, তোর দিদি ঠাগ্রুণীদের ব্যা"।

ধর্ম্ম'। হাঁ, হাঁ, শুভাচায্যেব মুখে শুনিতে ছিলাম্ বটে। তাঁর চারিটী কন্যাবি কি বিবাহ একবারে হবে ?

ভোলা। এজ্ঞে মোশাই।

ধর্ম্ম'। (স্বগত) এবারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্মণীব নত গড়ান হবে। (প্রকাশে তবে তুই যা, আমি পুথি লইয়া যাইতেছি।

ভোলা। যে এজ্ঞে—মুই তবে যাই।

[ভোলার প্রস্থান]

ধর্ম্ম'। একাকী যাওয়াটা ভাল হয় না, ছাত্রেরা কোথায় ?

[তর্কবাগীশেব প্রবেশ]

এই যে তর্কবাগীশ বাফা, ওহে একবার আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে ?

তর্ক। কোথায় যাইব ?

ধর্ম্ম'। আমার যজমানের বাটীতে বিবাহ, তুমি গেলে চাইল কলা সব আসে যাও তবে এস।

তর্ক। যে আজ্ঞা, চলুন্ তবে ; (পথে গমন) মহাশয়, আজিতো বিবাহের দিন নাই !

ধর্ম্ম। বাপু হে, সে কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমার যজমান কুলপালক বাড়ুয্যে, তিনি বল্লাল কৃত কুল কল্লোলে পতিত ; তাঁহার চারিটী কন্যা অনূঢ়াবস্থায় যৌবন যাপন করিয়াছে। তিনি এতাবদ্দিবস সমযোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত হন নাই, কুলভঙ্গ ভয়ে কন্যাগণের বিবাহ দিতেও পারেন নাই। (কিঞ্চিন্নয়ন মুদ্রিত করিয়া) আহা ! হা ! হা ! কি মহাপাতক—রাম ! রাম ! রাম ! বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত আছে "যাবন্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাং। তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ" ॥ অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যত রজোযোগ হয় তাহার পিতামাতা তত প্রাণি হত্যার পাপে পাপী হয়, এবং পৈঠীনসি কহিয়াছেন "যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া অথ ঋতুমতী ভবতি তদা দাতা

পতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃপিতামহ প্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যেতি"। কুচযুগল মুকুলিত না হইতেই বিবাহ দিবে এই বিধি, কিন্তু যদি অনূঢাবস্থায় ঋতুমতী হয় তবে কন্যাদাতা, বর, উভয়ে নরকে গমন করে, আর তাহার পিতা, পিতামহ, প্রভৃতি সকলে বিষ্ঠার হ্রদে কীটভাব লাভ করে। অতএব ঋতু হইবার পুর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবে এই শাস্ত্র, কিন্তু এক্ষণে বল্লালকৃত কুল-গৌরব গৌরব-লোভে কুলপালক এই সকল যুক্তিসিদ্ধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করিয়া কতশত পাতক না স্বীকার করিয়াছে? এতদিনের পর কোথা হইতে অশেষ দোষাকর কুলীন এক পাত্র পাইয়া অত্র অদিনে, অক্ষণে, তাহাকে কন্যা চতুষ্টয় প্রদান করিবে? করুক, যাহার যাহা অভিমত,—দক্ষিণা প্রাপ্তি হইলেই আমার অভিমত সিদ্ধ হয়, দিনের কথায় কায কি?

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভাল, এক কথা জিজ্ঞাসা করি "যাহার কন্যা সে কুলীনপাত্র না পাইলে কুল-ভঙ্গ ভয়ে বিবাহ দিতে পারে না সুতরাং তাহাতে পাপ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু বয়োযোগ হইলে সে কন্যাকে কে গ্রহণ করিয়া এমত্ পাপে লিপ্ত হয়?"

ধর্ম্ম। সেও ঐ কুলীন মহাত্মারা, তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি নেত্রপাত করেন্ না, অর্থ পাইলে পরমার্থ বোধে সকল দুক্রিয়াই করিয়া থাকেন্। তাহাদিগের বয়ো-বিবেচনা, গুণ-পর্য্যালোচনা, সৌন্দর্য্যাভিলাষ, জাতি-বিনাশ শঙ্কা, লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই;—অর্থ লোভে এক ব্যক্তি একশত পর্য্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন্, কাহার বা বিবাহব্যাপারে আলস্য নাই!

[অধর্ম্ম'রুচির প্রবেশ]

অধর্ম্ম'। কে হে তুমি 'বে' তে আল্‌স্যির কথা বলচো? বে কর্ত্তে কি আলস্যি হয়? গেলেম্—বে কল্লেম্—যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম্—চল্যেম্—আর কি? "বে অরুচির রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্যি আছে?"

ধর্ম্ম'। (জনান্তিক) তর্কবাগীশ, এই দেখ এক মহাপুরুষ! (প্রকাশে) না তাহ' নয়, আমি একটা কথার কথা কহিতে ছিলাম্;—আপনার নিবাস কোথা মহাশয়?

অধর্ম্ম। শ্বশুরবাড়ি।

ধর্ম্ম'। শ্বশুরবাটী নিবাস ইহা কেমন কহিলেন্?

অধর্ম্ম'। যেখানে থাক্তে হয় সেই নিবাস।

ধর্ম্ম'। আপনি কি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন?

অধর্ম্ম'। (সক্রোধে) আঃ আমি কি ডোম, যে ধর্ম্মশাস্ত্র শিখে ধর্ম্মপণ্ডিত হব ?

ধর্ম্ম'। আপনি ক্রোধ করিবেন না, জিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে—লোকে করে থাকে, তায় ক্ষতি কি ? বলুন্‌না কেন কি ব্যবসায় করেন্ ?

অধর্ম্ম'। আমার বিবাহ ব্যবসা আর কি ব্যবসা ?

ধর্ম্ম'। বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হয় ?

অধর্ম্ম'। হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন তার হাজাশুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা "রাজারও ধেয়েত নই, সেধেরও খাতক নাই" আপনি কি কুলীনেচ্ছেলের বিষয় জানেন্ না ?

ধর্ম্ম'। হাঁ জানি, বিশেষ জানি না, আপনারা শ্বশুর বাটীতে কিরূপ থাকেন্ ?

অধর্ম্ম'। শ্বশুরবাড়ির সুখের কথা একমুখে কত কব ?

বরফী তুলিয়া হাতে দাঁত দিয়া কাটি।
পায়স আঙুলে করে বসে বসে চাটি॥
ভোজনে ওজন বুঝে ঘন দুধবাটি।
শয়নে কেমন সুখ পরিপাটি পাটি॥
আলাপে শীলতা বড় কথা কাটাকাটি।
সম্বল কিছুই নাই মুখে মালসাটি॥
বসিয়া মজাগি করি কখন না খাটি।
অহঙ্কারভরে মোরা না মাড়াই মাটি॥

ধর্ম্ম'। হাঁ, হইতে পারে, আহারাদির ক্লেশ ঘটে না বটে, কিন্তু সংসারি মানব মাত্রেরই অর্থ প্রয়োজনীয় যদি কোন কারণে ধনের প্রয়োজন হয়, কি করেন্ ?

অধর্ম্ম'। তাহাও সে থায় পাওয়া যায়,—দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণে না পেলে কি সেথা থাকি ? কেন থাক্‌বো ? বরং অতিত হয়ে অন্যের বাড়িই সিদ্ধপক করি—তা ভাল মশা তাড়াই—সেও আচ্ছা, তবু কুলমর্য্যাদা নাপেলে কদাচ সেথায় থাকিনে ;—আমরা এমন গুরুর শিষ্য নই।

ধর্ম্ম'। শ্বশুরালয়ে অধিক দিন থাকিলে আদর গৌরবের কিছু হানি হয় না ?

অধর্ম্ম'। (ঈষদ্ধাস্য মুখে) না মহাশয়, কুলীনের ছেলে যত অধিক কাল শ্বশুরবাড় থাকে তত অতি আদর বাড়ে,—তা থাক্তে পাই কৈ ? 'বচ্ছরে তিন শত ষাটি দিন' বৈত নয় ?

ধর্ম্ম'। (উচ্চ হাস্য মুখে) আপনি কত সংসার করিয়াছেন ?

অধর্ম্ম। আমাদের কুলীনেছেলে অনেক 'বে' করে থাকে, কিন্তু আমি ধর্ম্ম-ভীত অধর্ম্মরুচি মুখুয্যে, আমি অধিক করি নাই।

ধর্ম্ম। তবু কত, শুনিতে পাই না?

অধর্ম্ম। শুন্তে পাবেন্ না কেন? আমি সাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ আর 'বে' করি নাই;—কতগুলো 'বে' কলে' কি হবে? আমাদাদা মহাশয় চারি কুড়ি পোনের টা 'বে' করেছেন, এখন তিনি অস্থিদন্ত হীন হয়েছেন তবু পেলে ছাড়েন না।

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) আপনি এত অল্প বিবাহ করিয়াছেন? ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি "আপনি বিবাহিত ৭৪টী স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন?

অধর্ম্ম। ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন্, আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারি নে, অথবা যার ধর্ম্ম সেই রক্ষা করে; নামাধর্ম্ম এই যে "আমরা কুলীনের ছেলে, ধর্ম্মে২ কিছু পেলে ছাড়িনে" সে কথায় কায কি? নমস্কার মহাশয়, আমি পিতার তত্ত্বে এসেছি, দেখি তিনি কোথায়।

ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া অধর্ম্মরুচির প্রস্থান।

ধর্ম্ম। শুনিলে তর্কবাগীশ?

তর্ক। আজ্ঞা, শুনিলাম, কি চমৎকার২! কি ভয়ানক ব্যাপার! বল্লালসেন গৌড়রাজ্যে ধর্ম্ম নির্ম্মূলনার্থ ধূমকেতু স্বরূপ উদিত হইয়াছিল, যথার্থই বটে!

ধর্ম্ম। বাপু হে, বলিব কি? পূর্ব্বে কুলীন শব্দে নয় গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইত, এইক্ষণ আর তাহা নাই। কুকার্য্যে যে লীন তাহাকেই 'কুলীন' কহে, হা বিধাতঃ! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে কি পর্য্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল! হে বসুন্ধরে, বিবাহ করিয়া পত্নীর ভরণ পোষণ ও ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয় ইহা যাহাদিগের কর্ণকুহরেও কদাচ স্থান পায় না—সর্ব্বদাই বিবাহ বাণিজ্যে দীক্ষিত থাকে তাহাদের পাপ ভরেই তুমি ভারাক্রান্ত রহিয়াছ! স্ত্রীজাতির কাম পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ শাস্ত্রে কথিত আছে, কিন্তু এই সকল বল্লাল-দত্ত কৌলীন্য চিহ্নধারি কুলীন মহারথিরা ইহা বিবেচনা না করিয়া শতাধিক বিবাহ করেন্ ইহাতে ঐ বিবাহিত কুলকামিনিগণের প্রত্যেকের কি ধর্ম্ম রক্ষা হয়? বিবাহের পর জীবনকাল মধ্যে কোন শ্বশুরালয়ে ইঁহারা দ্বিবার, কোথায় ত্রিবার, পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কি রূপে রক্ষিত হইবে? বর্ত্তমান কালে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার সম্যক্ প্রথা নাই, সুতরাং তাহারা অন্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত করিতে পায়না, চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ যৌবন যাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই

হিতাহিত বিবেচনা বিহীনা হইয়া স্বস্ব সমীহিত সাধনে যত্নবতী হয়, তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার তাহাদের ক্রভঙ্গের আনুসঙ্গিক ফল হইয়া উঠে। মনু কহিয়াছেন।

"বাল্যে পিতুর্বশ তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং"। বাল্যকালে পিতা, যৌবনে পরিণেতা, এবং পতির লোকান্তর হইলে পুত্রগণ, স্ত্রী জাতির আবরক হয় এবং 'পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনং। স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসং দূষণানি ষট্।"।

মনু এই শ্লোকে স্ত্রীজাতির ষট্‌প্রকার দূষণ গণনাতে পতির সহিত চিরবিরহেরও পাতিব্রত্য নাশকতা কহিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গালি প্রথায় কুলীন কন্যা ও কুলীন কর্ত্তৃক বিবাহিত বনিতাদিগের প্রায় অহরহই বিরহ-বেদনা সহ্য করিতে হয়, ও চিরদিনই পিত্রালয়ে থাকিতে হয়, সুতরাং তাহারা কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে? ব্যভিচার দোষে অবশ্যই লিপ্ত হয়।

তর্ক। যথার্থ মহাশয়।

ধর্ম্ম। আমরাও সেই সকল ব্যক্তির ঘটকালীকার্য্যে ভূরি ভূরি মহাপাতক স্বীকার করিতেছি! কি করি, কাল ধর্ম্ম সহকারে সকলি করিতে হয়!

[নিজপিতা বিবাহবণিকের সহিত অধর্ম্ম-রুচির পুনঃ প্রবেশ]

বিবাহ। তার পর বাপু, কি হলো?

অধর্ম্ম। তার পর মাধবপুরে যাচ্ছিলাম এই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ; ভাল হল, তবে একটা মন্ত্রণা। জিজ্ঞাসা করি কি কর্ব্যো বলুন দেখি?

বিবাহ। কি বল?—কেন এত বিষণ্ণ মুখেরহিলে?

অধর্ম্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জৈত্রপুরের দোকানে বসে আমি মৌতাত্ কচ্ছিলাম এমন সময়ে এক বেটা নাপ্‌তে নকুলপুর থেকে একখানা পত্র এনে দিলেক।

বিবাহ। নকুলপুরে তুমি কি বে করে ছিলে?

অধর্ম্ম। আপনি কি করে জানিলেন্?

বিবাহ। বলি এ আর জান্তে কি? কুলীনের ছেলে তিনকুলে কে আছে যে চিঠী লিখিবে? তা পত্রে কি লেখা আছে?

অধর্ম্ম। আমিতো লেখাপড়া শিখি নি, সেই দোকানি তা পড়িল।

বিবাহ। কি বৃত্তান্ত?—কেন বাপু অধোমুখে নিরুত্তর হইলে? কোন অমঙ্গল সম্বাদ না কি? বল বাবা কি হয়েছে?

অধর্ম্ম। (অধোমুখে) হাঁ—এক প্রকার অমঙ্গল বটে, "সেথায় আমার একটী মেয়ে হয়েছে, তার অন্নপ্রাশন নিমিত্তে আমার সম্বন্ধী আমাকে সেথায় যেতে লিখেচে," দোকানি বেটা তো এই বল্লে।

বিবাহ। ও্যাঃ—হা! কন্যা হলো! পুত্র সন্তান হলে ভাল হতো! ঈশ্বরের ইচ্ছা এতো অন্যের সাধ্য নয়, তা কি কর্ব্বো; তবে কিনা আমাদের কন্যাগত কুল, তাহার বিবাহ সময়ে কুলকর্ম্ম কর্ত্তে হবে, না পারিলে কুলভঙ্গের সম্ভাবনা বটে, তা কি কর্ব্বো বাপু? যাও, অন্নপ্রাশন হয় গে।

অধর্ম্ম। বাবা, তার নিমিত্তে বল্‌চি না।

বিবাহ। তবে কি নিমিত্ত?

অধর্ম্ম। কি বল্‌বো বাবা, লজ্জা হয়; সেদেশে প্রায় তিন বচ্ছর যাই নাই, তাই বলি 'মেয়েটা হলো!'

বিবাহ। (উচ্চহাস্য করিয়া) বাপুহে, তাতে ক্ষতি কি? আমি "তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়!" তা বাপু আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি? যাও বাপু, তারা আমোদ করে লিখেছে যাও, লজ্জা কি?

[অধোমুখেই অধর্ম্মরুচির প্রস্থান।

বিবাহ। (স্বগত) আমার কিছু টাকা চাই, কোথা যাই, বেলাও অনেক হয়েছে, নিকটে কি কোন শ্বশুর বাড়ি নাই? (চিন্তাকরিয়া) হাঁ, যেন মনে হচ্চে, এখান হইতে এক ক্রোশ হইবে বিমলাপুর, সেখানে বুঝি একবার বে হয়ে ছিল (পুনশ্চিন্তা করিয়া) আমিই সেথায় বে করেছি না পুত্রের বে দিছি? ভাল মনে হচ্চে না—পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিব? (কিঞ্চিদ্ভাবিয়া) না, আমার কাছে তো ফর্দ্দ আছে তাই দেখি না কেন? (ফর্দ্দ খুলিয়া) হাঁ, এই যে "১২৫২ সালে, ৩ রা মাঘ, বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে আমিই বে করেছি" হুঁ, দেখেছ, লেখাপড়া রাখা ভাল, মনে করে কতো রাখা যায়? লেখা ছিল এইতো মনে হলো, নৈলে কি হতো? যাই, এখন সেখানেই যাই; কিন্তু সে বামণ বামণ-পণ্ডিত, কিছু দিতে পারে এমন বোধ হয় না। ভাল, ব্রাহ্মণীর কাট না কাটাও কি কিছু নেই? দেখে আসিনে কেন? কিন্তু যদি বাবাজীর মত আমারও কন্যা হয়ে থাকে, তবেই তো বিভ্রাট। (কিঞ্চিদ্গমন করিয়া) কোন পথটা দে যাব; কাহাকেও যে দেখিতে পাইনা, জিজ্ঞাসা করি কাকে?

[উত্তম মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

(প্রকাশে) ওহে, কে হাঁ তুমি, বিমলাপুরে কোন পথে যাব, বলিতে পার ?

উত্তম। বিমলাপুরে যাবেন্ ? আমার সঙ্গে আসুন। আপনি বিমলাপুরে কার বাড়িতে যাবেন্ ?

বিবাহ। কমল ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ি।

উত্তম। তথায় কি প্রয়োজন ?

বিবাহ। আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি, তাই একবার তত্ত্ব বৃত্তান্ত করিতে যাই।

উত্তম। মহাশয়ের নাম কি ?

বিবাহ। আমার নাম শ্রী বিবাহবণিক মুখোপাধ্যায়।

উত্তম। তবে আমি প্রণাম করি (প্রণিপাত)

বিবাহ। বাপু তুমি কে ? আমাকে প্রণাম করিতেছ।

উত্তম। আমি মহাশয়ের পুত্র, আমার নাম উত্তম মুখোপাধ্যায়।

বিবাহ। পুত্র ! সে কি ? তুমি কাহার্ দৌহিত্র ?

উত্তম। আমি বিমলাপুরের শ্রীযুক্ত কমল ন্যায়ালঙ্কারের মহাশয়ের দৌহিত্র।

বিবাহ। তবে যথার্থ ইতো বটে, এস২ বাছা এস (মস্তকে হস্তার্পণ)

উত্তম। আমি আজি কৃতার্থ হইলাম— 'জন্মাবধি পিতৃ দর্শন পাই নাই'।

বিবাহ। (স্বগত) তুমি দর্শন পাবে কি তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই —সেই শুভ দৃষ্টি মাত্রই যা হউক। কৈ, অধর্ম্মরুচি বাফা এখন কোথায়,—কন্যা হয়েছে বলে বড ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন্ এসে, আমার এক কালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে ! (প্রকাশে) হাঁ, আমারও আজি পরম আহ্লাদ—'পুত্রের সাহিত সাক্ষাৎ হইল'।

উত্তম। মহাশয়ের শরীর ভাল আছে ?

বিবাহ। হাঁ বাপু। তোমাদের সকল মঙ্গল ?

উত্তম। আজ্ঞা, শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সকলই মঙ্গল।

বিবাহ। (স্বগত) দূর হউক, আর সেথায় যাব না, (প্রকাশে) উত্তম,—বাপু তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হলো, সেথাকার সংবাদ পাইলাম, তবে আর যাইবার আবশ্যকতা কি ? তুমি যাও, আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তথায় যাই।

উত্তম। না মহাশয়, আপনাকে যেতে হবে, চলুন্।

বিবাহ। কেন আর মিছে কর্ম্ম ভোগ ? সংবাদ ত পেলাম।

উত্তম। না না, তা হবে না, যেতেই হবে।

বিবাহ। কেন, তুমি এতো আকিঞ্চন করিতেছ কেন ?

উত্তম। আজ্ঞে, আমি আকিঞ্চন করিতেছি তার কারণ আছে।

বিবাহ। কি নিমিত্ত বল, শুনি।

উত্তম। মহাশয়, আজি তিন বৎসর হইল আমি মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম সে সম্বাদ মিথ্যা; কিন্তু তাহাতেই আমার মাতৃঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন। অন্ত আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি এই সম্বাদ বাটীর সকলকে জানাইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাই মহাশয়কে এতো আকিঞ্চন করিয়া লইয়া যাইতেছি;— তাঁহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতা ঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে।

বিবাহ। (হাস্তমুখে স্বগত) স্বামী স্ত্রীর সকল দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পায় না, দেখ আমি কি ভাগ্যবান্ তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হা অদৃষ্ট ! (প্রকাশে) চল বাপু তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

[গর্ভবতীর প্রবেশ।

গর্ভ। (রোদন করিতে২)

সংসারেতে ছিল সাধ, তাহে হলো বিসংবাধ,
বিধাতা সাধিল বাধ, সাধনা পুরাল না।
বাঁচিয়া নাহিক সুখ, কেবল সতত দুখ,
দেখাইতে কালামুখ, আর নাহি বাসনা ॥
একোটা এক প্রকার, দেখে হই চমৎকার,
গুণকথা কহি কার, কেহ ভাল বাসে না।
শাশুড়ী বাঘিনী প্রায়, ননদী নাগিনী তায়,
যদি কোন ছল পায়, তবে রক্ষা থাকে না ॥
প্রাতিবাসী যদি আসি, হয় মোরে মিষ্টভাষী,
অমনি সে সর্ব্বনাশী, প্রকাশিতে ছাড়ে না।
শাশুড়ী তা শুন্তে পেলে, ভূতছাড়া করে গেলে,
দিতে এসে নুড়ো জ্বেলে, বিবেচনা করে না ॥
পেলে অপরাধ তিল, তালের সমান কীল,
বুকে পিঠে লাগে খিল, নাহি থাকে চেতনা।

ভাতারের মুখে ছাই, মরণতো তার নাই,
তা হলে নিকুলে যাই, ঘুচে সব যাতনা ॥
মরি সদা মনস্তাপে, কি দেখে দিয়েছে বাপে,
খাকু তাকে কাল সাপে, যে করেছে ঘটনা।
মরণ হইলে হয়, পোড়া প্রাণে কত সয়,
যম গেছ যমালয়, একবার ডাক না ॥

আমিতো আর সহিতে পারিনে, বিধাতা যদি দিন দেয় তবেই দিন পাব! যাই দেখি পুরুতের বাড়ি (পথি মধ্যে) এই যে পুরুত ঠাকুর, এই দিকেই আশ্চেন। (নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া রোদনারম্ভ করিল)

ধর্ম্ম। কেও? হরির মা? কেন মা রোদন করিতেছ? বালকেরা তো ভাল আছে?—কেন মা? যে বড রোদন করিতে লাগিলে, কিজন্যে? চক্রবর্ত্তি বাফা কি কিছু বলিয়াছেন?

গর্ভ। আমার আর কেউ নেই, আপনি রক্ষা করুন। (চরণ ধারণ)

ধর্ম্ম। কেন২ মা? ছাড২, আমাকে যাহা বলিবেন তাহাই করিব;—বল কি করিতে হইবে?

গর্ভ। "এবার যেন আমার এট্টী মেয়ে হয়" এই সংকল্প করে কালি কিছু স্বস্ত্যেন করিবেন বলুন্, নৈলে আমি তোমার কাছে স্ত্রীহত্যা হব।

ধর্ম্ম। অবশ্য করিব, এই বৈতো নয়, তাহার নিমিত্ত আর চরণ ধারণ কেন? ছাড।

গর্ভ। (চরণ ত্যাগ করিয়া) তবে আমি উদ্যুগ করি গে?

ধর্ম্ম। হাঁ, যাও, একটী কন্যা কি ইচ্ছা করিয়াছ? (হাস্যমুখে) হাঁ, হাঁ, অভিলাষ হইতে পারে, কন্যা সন্তানটা বড় স্নেহ পাত্র বটে, বিশেষত "দশপুত্র সমাকন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে" কন্যা যদি সৎপাত্রে প্রদান করা হয় তবে সে কন্যা দশপুত্র তুল্যা। আর কন্যাদানের ফলও বড—ক্রিয়া যোগসারে কথিত আছে "কন্যাপ্রদানকৃতো নাস্তি স্বর্গাদাগমনং পুনঃ"। যে ব্যক্তি কন্যাদান করে তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়। এই সসাগরা ধরা দান করিলে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্যে কন্যাদাতার অধিকার তার, ইহার প্রমাণ বচনটা তর্কবাগীশ স্মরণ হয় হে?

তর্ক। আজ্ঞা, বড় মনে হইতেছে না।

ধর্ম্ম। নাই হলো, ভারতেও লিখেছেন "দৌহিত্রস্য মুখং দৃষ্ট্বা কিমর্থমনুশোচতি। এবং, তেন দৌহিত্রজানলোকান্ প্রাপ্স্যামিতি মে মতিঃ"। কন্যা সন্তান দ্বারা দৌহিত্র

মুখ দর্শন হয় তাহাতেই 'দৌহিত্রজ' নামে স্বর্গ লাভ হয়, সুতরাং এই সকল কার্য্য অনুসন্ধান করিলে কন্যা সন্তান প্রসবে অভিলাষ হয় বটে।

গর্ভ। তার্জন্যে বড নয়।

ধর্ম্ম। তবে কি নিমিত্ত কন্যার প্রার্থনা ?

গর্ভ। সেই পোড়ারমুকো মিন্‌ষে আমাকে মেরেছে। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ধর্ম্ম। রাম রাম ! স্ত্রীলোকের নিগ্রহ, একি ! "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"। দেবতাবা কহিয়াছেন "পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীলোকই ভগবতীব অংশ " তৎপ্রতি দণ্ড, একি ! বিশেষত মনু কহিয়াছেন "শোচন্তি জা-ময়োযত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং। ন শোচন্তি হি যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা"। যে কুলে কুলকামিনীরা রোদন করে সে কুল শীঘ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে তাহারা আহ্লাদিত থাকে সে কুল সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল হয়, অতএব চক্রবর্ত্তী কেন ধর্ম্মাতিবর্ত্তী হইয়া তোমাকে নিগ্রহ করিলেন ? বাছা তুমি কি কোন অপরাধ করিয়াছ ?

গর্ভ। এমন্ কিছু করি নাই কেবল পুত্র প্রসব করেছিলাম্।

ধর্ম্ম। তাহাতে অপরাধ কি ? সৌভাগ্যবতী নারী পুত্র প্রসব করে, বিশেষত "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনঃ"। পুত্রের নিমিত্তই দার গ্রহণ করিতে হয় নতুবা ভার্য্যার প্রয়োজন কি ? বিষ্ণুসংহিতাতে লিখিত আছে "পুন্নাম্নোনরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্রইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥"—যে ব্যক্তি 'পুন্নাম' নরক হইতে নিষ্কৃতি করে সেই পুত্র। যাহার দুরদৃষ্ট দোষবশে পুত্রমুখ নিরীক্ষিত হয় তাহাকে পুন্নাম নরক ভোগ স্বীকার করিতে হয়। অতএব পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছ, তাহাতে অপরাধ কি ?

গর্ভ। না, এক পুত্র না, অনেক পুত্র প্রসব করেছি।

ধর্ম্ম। তাহাতো অতি উত্তম "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ"। সংসারিরা বহু পুত্র ইচ্ছা করিবে যেহেতু অনেক পুত্র মধ্যে যদি কেহ গয়াধামে গমন করে, তাহা হইলেই চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে। আর এক পুত্রে বংশ রক্ষার ও সন্দেহ, ভারতে কথিত আছে " একপুত্রোহপুত্রোমে তস্য মতঃ কৌরবনন্দন। একচক্ষুর্যথা চক্ষুর্নাশে তন্ধাদ্ধএসবঃ"। যেমন কাণ ব্যক্তির বর্ত্তমান যে এক চক্ষু তাহে আস্থা নাই, তন্নাশ হইলে অন্ধ হইতে হয় সেইরূপ এক পুত্রির সে পুত্র বিনাশ হইলে তাহার বংশ নির্মূলিত হইয়া যায়। বিশেষত নিমিত্তনিদানে কথিত আছে "বহুপুত্রবতী নারী সুখসৌভাগ্য শালিনী।" যে স্ত্রী বহুপুত্র প্রসবিনী সে লক্ষণাক্রান্তা, অতএব হরির মা, বাছা তুমি অনেক পুত্র প্রসব

করিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ ইহাতে তোমার অপরাধ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গর্ভ। তবে আপনি শুনুন্, আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর পাঁচ্টা মেয়ে বেচে কোটা কবেছেন্, আরো এখনো দুটো আছে। আমার চারিটীই ছেলে, মেয়ে হয় নি তাই আমাদ্দের সেই মিনষে আমারে সব্বদা তাডনা করে, বলে 'এমন্ হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে'। এবার আবার সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজি কোথা থেকে এসেই আমাকে নিগ্রহ কল্যে, আর বল্যে 'এবার যদি না মেয়ে হয় দূর করে দেবো' তাই আপনি দয়া করে কিছু ষয্যেন করুন্ যেন এবার মেয়ে হয়—আর আমি জ্বালা সৈতে পারিনে। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

ধর্ম্ম। (কর্ণে কর দিয়া) আঁা একি শুনি? রামঃ। নারায়ণঃ! কন্যা বিক্রয়! যাহা শ্রবণেও পাপ স্পর্শে। এতাদৃশ ব্যাপারেও প্রাণিদিগের অভিরুচি! হা ভগবন্, এ কি? পদ্মপুরাণে কথিত আছে "কন্যা বিক্রয়িণোনাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ পুনঃ"। যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে তাহার নরক হইতে নিস্তার নাই, সে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকে। এবং ক্রিয়াযোগসারে কথিত আছে "যঃ কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ো মোহাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ। স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংকুলং"। যে ব্যক্তি নিতান্ত ধন গৃধ্নুতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যা বিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে তাহাকে বিষ্ঠা হ্রদ নরকে গমন করিতে হয়। এবং "কন্যা বিক্রয়িণঃ পুংসোমুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ। পশ্যেদজ্ঞানতোবাপি কুর্য্যাদ্ভাস্করদর্শনং॥ যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ির মুখাবলোকন করে সেও সূর্য্য দর্শন স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। "যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম কন্যা বিক্রয়িণঃ পুনঃ। শুভং তৎ সকলং বিপ্র গচ্ছেদ্বিফলতাং প্রতি"। কন্যাবিক্রেতা যদি কোন সৎকর্ম করে তাহাও তাহার বিফল হয়। আর অধিক কি বলিব "তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী"। কন্যাপুত্র বিক্রেতা যে স্থানে বাস করে সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হয়। অপর কুল সর্ব্বস্ব গ্রন্থে লিখিত আছে "ন কুর্য্যাদর্থসম্বন্ধঃ কন্যাদানে কদাচন"। কন্যাদাতা কন্যাগ্রহীতার সহিত কদাচ অর্থ সম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্যা-বিক্রয় দোষে লিপ্ত হয়, এই শাস্ত্রানুসারে অদ্যাবধি সজ্জনগণ কদাচ বরপক্ষের দ্রব্যসামগ্রীও গ্রহণ করেন্ না এবং দৌহিত্র মুখ নিরীক্ষণের পূর্ব্বে জামাতৃ গৃহে অভ্যবহারেও বিমুখ থাকেন। শাস্ত্রে এই রূপ শুক্রবিক্রয়ির অশেষ প্রকার নরক লেখে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পামর প্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্ব্বিধ পাপপুঞ্জ স্বীকারে বসুমতীকে দূষিত করিতেছে! বাছা হরির মা, তুমি এক্ষণে

গৃহে যাও, আমি আশীর্ব্বাদ করিলাম তোমার কন্যা হইবে, আর স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে না। [গর্ভবতীর প্রস্থান]

তর্কবাগীশ শুনিলে, কি কদর্য্য ব্যবহার! কন্যা বিক্রয়, কি আশ্চর্য্য২ !!!

তর্ক। সম্পন্ন ব্যক্তিরা কি করে? যাহারা দরিদ্র তাহারা কি করিবে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্তই এই সকল পাপ স্বীকার করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম। রেখে দেওহে সংসার যাত্রা। বৃক্ষে কি পত্র নাই? —নদীতে কি জল নাই?—অরণ্য ভূমিতে কি স্থান নাই?—পল্লবে কি শয্যা রচনা হয় না?—বামবাহু কি উপধান হইতে পারে না?—বল্কল কি পরিধেয় নহে? এই পৃথিবীতলে জগদীশ্বরদত্ত অযত্ন সুলভ কি না আছে? কি না পাওয়া যায়? সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়—সকলই মিলে—তবে কি নিমিত্ত এই মহাপাতক?

তর্ক। মহাশয়, বর্ত্তমান কালীন মানবগণমধ্যে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা অত্যল্প লোকের আছে, অলৌকিক যে পাপ পদার্থ তাহা কত লোকে বিবেচনা করে? সুতরাং তাহাতেই এই দুষ্কার্য্যের প্রচার আছে।

ধর্ম্ম। তা শাস্ত্রই যেন না মানিলেক, কন্যা বিক্রয়ের দৃষ্টদোষও দর্শন করে না?

তর্ক। দৃষ্টদোষ শুনিতে ইচ্ছা করি।

ধর্ম্ম। শুন্‌বে, শুন "অজস্র পর্য্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক যে কন্যার লালন-পালন করা যায়, পোষিত গৃহ কুক্কুটের ন্যায় তাহাকে বিক্রয় করা কি বিহিত কার্য্য? বিশেষত কন্যাবাণিজিকেরা পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, রীতি, চরিত্র, কিছুই বিবেচনা করে না যাহার নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিরূপ, নির্গুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন করে, "—আহা! তাহারা কি নির্দয় !! কি নিষ্ঠুর২ !!! এই সকল ব্যাপারেই এতদ্দেশে মহা অমঙ্গল ঘটিতেছে।

তর্ক। দেশের অপকার কি?

ধর্ম্ম। নয় কেন? "কোন ব্যক্তি, রুগ্ন, ভুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়াও ধন গৌরবে কোন সুরূপা কামিনীর কর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার অমূল্য যৌবন ধারণের বৈফল্য বিধান করিতেছে" কোথা বা "উত্তম বিদ্বান্, রূপবান্, চরিত্রবান্, যুবক নির্ধনতায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেছে' ইহাতে এ প্রদেশে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে দেখ দেখি।

তর্ক। ভাল, প্রজার পক্ষে এমন্ অনিষ্ট, রাজা কেন বিবেচনা করেন্ না?

ধর্ম্ম। ঐতো আক্ষেপের বিষয়! বল্লালি কুপ্রথার পরিবর্ত্তনে ও অপত্য বিক্রয় বারণে যদি রাজ-পুরুষেরা মনোযোগি হন তবেই বঙ্গভূমির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাঁহারা প্রজার ধর্ম্মে হস্তার্পণ করেন্ না!

তর্ক। মহাশয়, এতো ধর্ম্ম নয়, যাহা বিহিত কার্য্য তাহাই ধর্ম্ম। এক ব্যক্তি 'যত অভিলাষ ততই বিবাহ করিবে,' কেহ বা 'বিবাহ করিতেই পারিবে না'—ইহা কি প্রকারে বিহিত হয়? বিশেষত "রাজ্যে মনুষ্য-বিক্রয় হইবে না" এরূপ রাজনিয়ম আছে, এ নিয়মানুসারে কন্যা বিক্রয় নিষেধ হইতে পারে এবং "স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে হয়" এ নিয়মেও ফলেং বিবাহ-বাণিজ্য নিবারণ হয়।

ধর্ম্ম। হাঁ বাপু, ভাল বলিয়াছ। আমিও এই বঙ্গরাজ্যের সাময়িক উন্নতি দেখিয়া বোধ করি ক্রমশ রাজপুরুষেরা এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনিতো কন্যা বিক্রয়ের দোষঘোষণ করিলেন, ভাল, কন্যা ক্রয় করিয়া যাহারা বিবাহ করে তাহাদিগের কিছু দোষ আছে কি?

ধর্ম্ম। কিছু কেমন্?

তর্ক। বলুন্ না কি দোষ, শুনিতেং যাই—ভাল, জানা থাকা ভাল।

ধর্ম্ম। ক্রয় করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহই সিদ্ধ হয় না; অন্যেপরেকাকথা "ক্রয় ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে। ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ"॥ ক্রীত বিবাহিত স্ত্রী 'দাসী তুল্যা,' পত্নী নহে। আর তাহার পুত্রও 'দাস পুত্র' বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত আছে। "ক্রীতা যা রমিতা মূল্যৈঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে। তস্যাদেযো জায়তে পুত্রো দাসপুত্রস্তু স স্মৃতঃ"॥ এবং বিক্রীত কন্যার পুত্র সকলধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত তাহাকে চণ্ডালতুল্যও কহিয়াছেন। "বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়াঃ পুত্রো যোজায়তে দ্বিজঃ। স চণ্ডালইব জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিস্কৃতঃ"॥ অপর রাজা যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন্ তাহা হইলে সে স্ত্রীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না; ব্রাহ্মণ যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন্ তবে সে স্ত্রীর পুত্র তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী হয় না, সে পুত্র সকল পুত্রের অধম "ন রাজ্ঞো রাজ্যভাক্‌স স্যাদ্বিপ্রাণাং শ্রাদ্ধকৃন্নচ। অধমঃ সর্ব্ব পুত্রেভ্যস্তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ"॥

তর্ক। মহাশয়, এ সকল প্রমাণ কোথাকার?

ধর্ম্ম। কেন? অতি প্রাচীন দত্তক মীমাংসায় ধৃত হইয়াছে।

তর্ক। তবেতো ক্রয় করিয়া বিবাহ করাও অতি মন্দ?

ধর্ম্ম। হাঁ (শংখবাদ্য শুনিয়া) চলং আমরা যাই (কিয়দ্দূরে যাইয়া) এই যে কুলপালকের বাটী, চল প্রবিষ্ট হওয়া যাউক।

তর্ক। আজ্ঞা, অগ্রসর হৌন।

[বাটীর মধ্যে উভয়ের প্রস্থান:

[নিজ শিশুর সহিত সুমতির প্রবেশ]

সুমতি। (শিশুরপ্রতি) বাছা একবার ডাক্না, মণ্ডে গেল কোথা? ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছেলেটা নে যাক্ না কেন?

শিশু। ওমা, তুই আমাকে ফলারে নে যা, আমি তোস্সঙ্গে যাব।

সুমতি। বাছা, আমি কি সেথায় যেতে পারি?

শিশু। কেন পারিস্ নে—তুই পারবি।

সুমতি। আমি যে মেয়ে মানুষ, কেমন করে যাব?

শিশু। না, তুই মেয়ে মানুষ্ নয়—তুই যাবি—আয়,—আমার সঙ্গে আয় (অঞ্চলাকর্ষণ)।

সুমতি। না বাছা, আমি গেলে লোকে নিন্দে কর্ব্বে; তুই ডাক্, সে এখন তোকে নে যাবে।

শিশু। ওমা, কাকে ডাক্‌ব? কে নে যাবে?

সুমতি। সেই মিন্‌সেকে ডাক্,—থাকে২ নিউদ্দেশ হয়।

শিশু। কোন্ মিন্‌সেকে মা? যে আমাদ্দের ঘর ছেয়ে ছিল?

সুমতি। না না, তাকে কেন?

শিশু। তবে আবার কোন মিন্‌সেকে ডাক্‌বো?

সুমতি। সেই কত্তাকে রে কত্তাকে; ছেলেটাও তেম্নি!

শিশু। কোত্তাকে, তাই বল্‌না কেন? আয় তু তু তু।

সুমতি। (সক্রোধে) না রে পোড়াকপালে ছেলে, কুকুরকে কেন?

শিশু। (সরোদনে) অাঁ২, তুইযে বল্যি কোত্তাকে ডাক, তবে আবার কোত্তা কে?

সুমতি। সেই তোদ্দের তাকে।

শিশু। (সাভিলাষে) ওমা আমাদ্দের তাকে কি আছে মা, বল্‌না মা, বল।

সুমতি। কি দায় হলো! এখানেও কেউ নাই যে বলে দেয়।

[উদর পরায়ণের প্রবেশ]

উদর। (উদরে হস্তদিয়া)

কালে২ সবগেল কি হইল ভাই।
পূর্ব্বমত ফলার নয়নে দেখি নাই॥
থাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি।

খাইতেং তাহা হইত অরুচি ॥
দিনং কতং জুটিত ফলার।
এখন মণ্ডার গন্ধ আর মিলা ভার ॥
এমন ছুর্ভাগাদেশে যারী ভয় নাই।
ভাবি সদা কোথা গেলে আদ্য শ্রাদ্ধ পাই ॥
বিবাহের দফাএফা বল্লালে করেছে।
খাতা পত্র যাহা ছিল হারিয়ে গিয়েছে ॥
তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
ফলার সন্ধান করি খুজিয়াং ॥

হায় কিছুই হলো না! এতোটা পরিশ্রম!

পরিশ্রম হলো সারা, নাহি মিলিল ফলার,
ফল আর জীবনে কি আছে।
গৃহ অন্নে নাই রুচি, ত্যজিছি লক্ষ্মীর খুচি,
লুচি বিনে কিসে প্রাণ বাঁচো ॥

শিশু। ওমাং, এই যে বাবা এয়েচে, আমি বাবার সঙ্গে যাব।

উদর। কি রে তুই এখানে কেন? একা এসিছিস্ নাকি?

শিশু। (শীঘ্র গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধারণ পূর্ব্বক) এই যে বাবা এয়েচেং ওবাবাং আমি মারসঙ্গে এইচি, ঐ মা দাড়িয়ে আছে (হস্তদ্বারা দর্শায়)।

উদর। (সুমতির প্রতি সক্রোধে) কি! এমন্ যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর! লজ্জা নাই! ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না? এই চারি দিগে পুরুষ এখানে আসা, দেক্‌বি একবার?

শিশু। বাবা, মা তোকে ডাক্‌তে এয়েচে।

উদর। আমারে ডাক্‌তে এসেছে কি আর কাকে ডাক্‌তে এসেছে, তার নিশ্চয় কি?

সুমতি। (সভয়ে) ফলারের কথা বল্‌তে এসেচি।

উদর। (সানন্দে) অাঁ, কি বল্যি! নিকটে য়ায়ং, এখানে কেহই নাই, এতো লজ্জাই কি? ভাল তুইতো আর নবধ্বাগমনের বৌ নোস্, (সুমতিকে নিকটে আনিয়া) কি বল দেখি, ফলার জুটেছে, বলিস্ কি নিমন্ত্রণ না অনিমন্ত্রণ?

সুমতি। অনিমন্তন্ন আবার কি?

উদর। তুই মেয়ে মানুষ কি বুঝবি? নিমন্ত্রণ অপেক্ষা অনিমন্ত্রণে অধিক

মজা, নিমন্ত্রণে পেটে খাওয়া হয়, কিন্তু অনিমন্ত্রণে পেটে পিটে দুয়েতেই হয়।

সুমতি। তা এতো আমি জানিনে; বাড়ুয্যের বাড়ি নিমন্তন্ন হয়েছে, সেথায় বে।

উদর। ঐ ওপাড়ায় কুলপালকের বাড়ি? ফলার কেমন রকম্?

সুমতি। (সাঙ্গভঙ্গে) 'ফলার আবার কেমন রকম্, কথা শুন্‌লে গা জ্বালা করে।'

উদর। হা ক্ষেপি, কিছুই যানিস্‌নে, ফলার তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম, আর অধম। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ শুন্‌বি? শুনে রাখ, যদি কখন কাযে লাগে।

উত্তম ফলার।

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদাব কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া, বড় মজা,
শুনে সক্‌সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডাগণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরী পুরী ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়ে সুখো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাতে,
উত্তম ফলার তাকে কই॥

মধ্যম ফলার॥

সরু চিড়ে সুখো দই, মর্ত্তমান ফাকাখই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়॥

অধম ফলার।

শুমো চিড়ে জলো দই, তিতগুড় ধেনো খই,
পেট ভরা যদি নাই হয়।
রৌদ্র্ রেতে মাথা ফাটে, হাতদিয়ে পাত চাটে,
অধম ফলার তাকে কয়॥

এইতো তিন প্রকার ফলার, তা সেথায় কোন প্রকার?

সুমতি। তা আমি কি জানি? আমি তো সেথায় যাই নাই।

উদর। পায়২ যেতে পারিস্নে? এবার অবধি যাস্ই।

সুমতি। (সহাস্য মুখে) ভাল তাই হবে, এমন তুমি যাও আর রজে কায নাই।

উদর। চল্যেম—দুর্গা দুর্গা।

শিশু। ও বাবা, আমি যাব।

উদর। (সক্রোধে) আঃ, পেচু ডাক্লি, দূর হ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটী ফলার পেলাম, এই তার দফা রফা হলো।

সুমতি। ছেলে মানুষ, জ্ঞান কি? তুহি ওকে সঙ্গে নে যাও।

উদর। হ্ঁাঃ, একেতো সেই থুব্ড়ো মেয়েদের বে, তায় আবার এই অযাত্রা। তুই ওকে নে ঘরে যা।

শিশু। (সরোদনে) অ্ঁা অ্ঁা অ্ঁা—ওমা আমি যাব।

সুমতি। (ঈষৎক্রোধে) আঃ, নে যাওনা কেন—ও কি তোমার ভাগ কেড়ে খাবে? ছেলে মানুষ, কাঁজ্চে।

উদর। মর মাগি, ওকে নে গে কি হবে? ও কি ফলার কর্ত্তে শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমন্রে, ফলার কর্ত্তে পার্বি?

শিশু। হা, আমি পার্বো।

উদর। ভাল, কেমন্ পার্বি বল দেখি 'কখানা পাত পাত্বি?'

শিশু। আমি 'এক খানা পাত পাত্বো'।

উদর। (সভ্রূভঙ্গে) এক খানা পাত? তবে খাবি বা কিসে—নিবি বা কিসে বল দেখি?

শিশু। আমি সব্ খাব।

উদর। তবেই হলো, আজিও তুই কিছুই শিখ্লিনে?

সুমতি। আঃ, শিকিই কেন দেওনা? তুমি কি পেটে থেকে পড়েই শিকেছ? ছেলে মানুষ, কি জানে, এত তাড়না কর কেন?

উদর। আঃ মলো, এমাগী বলে কি? ফলার কি কেউ কারু শেখায়? আমি আপনাহতেই শিখিছি, কিন্তু ছেলেটা তেমন হলো না! হবে কি, তুই যে প্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কলম দে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠশালে পাঠাইস্, তাহাতেই উচ্ছন্ন গেল। কালির আঁক পাড়্‌লে ধার কর্জ্জ হয় জানিস্ নে? আমারও ঐরূপ কিছু দিন হয়েছিল, মা বাপ্ আমাকে গুরু মহাশয়ের কাছে দশ বার দিন পাঠাএছিল, তাতেই নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাল সেই মা বাপ্ অম্‌নি অক্কা পেলে, আর আমায় পায় কে। তুই তেম্‌নি ছেলেটার মাথা খেতে বসিছিস্, ওকে নষ্ট কর্‌বি?—যা ইচ্ছে, আমি ওরে নে যেতে পারবো না।

শিশু। (সরোদনে) আমি যাব, আঁঃ।

সুমতি। ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও খেয়ে আস্‌বে।

উদর। ভালই খেতে পায় না—মন্দ সামগ্রী খেতে পাবে না কেন? তুই মাগি ভারি দুষ্ট, আমার অখ্যাত কচ্চিস্।

সুমতি। তুমি একে নে যাও, আর রঙ্গে কায নাই।

উদর। কি আপদ্, ওকে নে গে কি হবে? ও কি খেতে শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমন রে, তুই ফলার কর্ত্তে শিখিছিস্?

শিশু। (চক্ষুর জল মুছিয়া) হাঁ শিকিচি।

উদর। আচ্ছা, বল দেখি কেমন শিখিছিস্ 'ফলারে গে কি খাবি?'

শিশু। বাবা, 'আমি পরমান্ন খাব।'

উদর। দেখ্‌লি মাগি, দেখ্‌লি; ও বানর—ওর কি বুদ্ধি আছে? ফলারে কি পরমান্ন থাকে? (শিশুর প্রতি) ওরে লুচি, মতিচুর, সন্দেশ, দই, এই সকল আছে, এর মধ্যে 'আগে কি খাবি?'

শিশু। আমি আগে 'দই খাব'।

উদর। (শিশুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক) মরে যা, এমন সন্তান থাকা চেয়ে না থাকা ভাল! আগে দই খেলে কি আর কিছু খেতে পারে?

[রোরুদ্যমান শিশুকে অভিমানে ক্রোড়ে নিয়া গৃহে সুমতির প্রস্থান।]

বাবু উৎপাত গেল, এখন আমি যাই (পথে গমন) কৈ কাহাকেও যে দেখি না, একলাই যাব? (অগ্রে দেখিয়া) এই যে ন্যালঙ্কার মহাশয় আসিতেছেন।

[ন্যায়ালঙ্কারের প্রবেশ]

ন্যায়া। কে হে তুমি, কোথায় যাইতেছ ?

উদর। আমি, মহাশয় বের নিমন্ত্রণে যাবেন্ না ?

ন্যায়া। (নস্য লইয়া অট্টহাস্য মুখে) বিবাহ কোথায় হে ? ও পাড়ায় একটা বৃষোৎসর্গ।

উদর। আমি শুনিলাম 'বাঁড়ুয্যের বাড়িয় বে'।

ন্যায়া। হঁা হঁা, তাই বটে। কুলপালক একটা বৃদ্ধ বর আনিয়াছে তাহাকে চারিটা মেয়ে দিবে, তাই বলি 'বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষোৎসর্গ'। তাহা সে স্থানে গমন করিয়া কি হইবে ? কিছুই না চতুষ্পাটীর অৰ্দ্ধমুদ্রাও পাওয়া দুষ্কব ! কুলীন বরের বিবাহ কি বিবাহ ?

উদর। আমি কুলীন মৌলিক খুঁজি না, চৌবাড়ির টাকারও অনুসন্ধান করি না, বুঝিতে 'পারি ফলার ভাল হলেই বে ভাল হয়'।

ন্যায়া। হঁা, তাহা তোমার পক্ষে বটে। "কন্যাবর যতে রূপং মাতাবিত্তং পিতাশ্রুতং। বান্ধবাঃ কুল মিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"। অর্থাৎ কন্যা—বরের উত্তম রূপ হইলেই ভাল বিবাহ বোধ করে ; কন্যার মাতা—যে বরেব ঐশ্বর্য্য আছে তাহাতে কন্যার বিবাহ হইলেই কৃতার্থা হয় ; কন্যার পিতা—বিদ্বান্‌কে জামাতা করিতে নিতান্তই অভিলাষী থাকে ; এবং কন্যার ভ্রাতা, পিতৃব্য-ভ্রাতা প্রভৃতি বান্ধবগণ—বরের কৌলীন্য বিবেচনা করে ; কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিরা উত্তম মিষ্টান্ন পাইলেই অত্যুত্তম বিবাহ বোধ করে থাকে। সুতরাং তোমার পক্ষে ফলার ভাল হইলেই বিবাহ ভাল হয়।

উদর। আজ্ঞা, ঠিক্ বলেছেন তবে যাবেন্ না কি ?

ন্যায়া। চল যাওয়া যাক্, যাওয়াটা ভাল।

উদর। আসুন্ মহাশয় (উভয়ের কিঞ্চিদ্গমন)।

ন্যায়া। নাহে, ওপথে স্ত্রীলোকে গমনাগমন করিতেছে, এই পথেই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

[জলকলস কক্ষে মাধবী ও মহিলার প্রবেশ]

মাধবী। (স্বগত) আঃ, এপোড়া বসন্তকাল আর কতো কাল থাকিবে ? যায়২ তবু যায় না, আর যে বাঁচি না ?

দুরন্ত বসন্ত কাল, এযে যুবতীর কাল,
কালপেয়ে কি কাল ঘটায়।
পতির বিচ্ছেদ বাণ, কতো আর সহে প্রাণ,
বুঝি ত্রাণ নাহি ইথে পায়॥
কলঙ্ক শশাঙ্কোরে, সুধাময় বিষকরে,
বরিষণ করে নিরন্তর।
নাম তার নিশাকর, লোকে কহে সুধাকর,
আমি বুঝিলাম বিষাকর॥
মঞ্জরিল তরুগণ, ফল পুষ্পে সুশোভন,
লতায় বেষ্টিত হয়ে শোভে।
হেরিয়া চুতমুকুল, অলিকুল অনুকুল,
ব্যাকুল হইল মধুলোভে॥
বিহঙ্গম ঝাঁকে২, শাখায়২ ডাকে,
কল২ ধ্বনি অবিরত।
অতি সুমধুর স্বরে, গান করে পিকবরে,
কুহু২ শব্দ করে কত॥
পাখি বহুকথাকহ, বলে বহু কথা কহ,
শুনি মনে শোক উপজিল।
বনের পাখির কথা, শুনে পাই মনো ব্যথা,
কালে২ কিকাল ঘটিল॥
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে, মত্ত হয়ে রস রঙ্গে,
অনঙ্গের যজ্ঞ পূর্ণ করে।
সারি২ শুক সারী, গান করে কত সারি,
মরি২ কি হলো অন্তরে॥
মরাল মরাল বধূ, কেলি করে পেয়ে বঁধু,
দেখি মোর বঁধু মনে হয়।
দিবে কি সে দিন বিধি, পাব কি সে গুণনিধি,
পাইলেও নাহয় প্রত্যয়॥
সরোবর সুনির্ম্মল, শত২ শতদল,
তাহে আর নানা জলফুল।

কমলিনী সুসংমানে, নিরন্তর মধুদানে,
পরিতোষ পায় অলিকুল ॥
মাধবীর মকরন্দ, ভরে হয় মন্দমন্দ,
গন্ধবহ বহে নিরন্তর।
মলয় আলয় ছাড়ি, সদা ফেরে বাড়িং
বিরহির দহিতে অন্তর ॥
এ সব সামন্ত যার, বসন্ত নাম তাহার,
অনুমানি মদন প্রেরিত।
ছাই হয়ে ছাই হলো, মরে বাঁচে দেখাগেলো,
হায়২ একি বিপরীত ॥
এবার করেছি পণ, পূজি সেই ত্রিলোচন,
বর মেগে লব মনোমত।
কন্দর্পের দর্প চুর্ণ, পুন হলে আশাপূর্ণ,
এবার না বাঁচে হলে হত ॥

মহিলা। (পশ্চাদ্ভাগে দেখিয়া) কেও? ওলো মাধবি দিদি, চলে আয়২, একা২ কি বল্‌চিস্? —এট্টু শীঘ্রি আয়, কলসীই কি এত ভারি? জল বৈ তো নয়।

মাধবী। যাই গো যাই, এট্টু দাঁড়া। (নিকটে আগমন)

মহিলা। আছিস্‌তো ভাল? অনেক দিন দেখিনি, কেন? (দেখিয়া) কেন বোন্ এত কাহিল হয়েছিস্? কেন, মুখ মলিন, এমন বিশ্রী কেন হলি?

মাধবী। আর সখি বিশ্রীর কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতেছিস্? এই সরস মধুসময়ে মধুকরের সম্পর্ক না থাকিলে মাধবীর কি মনোহর শোভা হয়?

মহিলা। না ভাই, তোর কথা বুঝা যায় না, তুই খান্‌দুই বহি পড়েছিলি, তাই একবারে অধ্যাপক ভট্টচায্যির মত কথা কইস্! ভাল করে না বল্যে আমি বুঝ্‌তে পারি নে।

মাধবী। সখি তোমার মন এমন্ সরল যে আমার কথাও বুঝিতে পার না? বলি কি, কৃতান্ততুল্য দুরন্ত এই বসন্তকাল, এ সময়ে কান্ত বিরহে অন্তঃকরণ অশান্ত হইয়াছে তাহাতে কি রূপে সরসবদনে মদনবাণ সহ্য করি? তাই ম্লান মুখে আছি।

মহিলা। সই, তুই মদন মদন কচ্চিস্ মদন আবার কে? আমাতো এতে

বয়েস্ হয়েছে আমি কখন মদন খাইও নি। ছুঁইও নি; তা বল্‌না ভাই মদন কেমনতর?

মাধবী। (হাস্য মুখে) মদন কি খেতে ছুঁতে হয়? সে একজন দেবতা, কিন্তু পূজা করিলে তুষ্ট হয় তেমন্ দেবতা নয়।

মহিলা। তবে কেমন দেবতা? অপদেবতা? এই ভূত টুত যেমন তেম্‌নি নাকি?

মাধবী। ভূতই এক প্রকার বটে, কিন্তু অন্য ভূতে পেলে মন্ত্র তন্ত্রে ছাড়ে, ইহার আর সে যো নাই।

মহিলা। (সভয়ে) ওমা কি হলো? পাছে আমায় পায়। ওলো মাধবি দিদি, কোথা যাব? রাম২!

মাধবী। মরণ্ আরকি, এই যে বলে "হস্তির কাঁধে এসে যায়, হাস্না দেখে ভয় পায়" তাই যে দেখি!

মহিলা। না দিদি, যথার্থ আমার ভয় হয়েছে।

মাধবী। ভয় কি লো? সেকি সত্য সত্যই 'ভূত?' ভূত নয় রে সে 'অদ্ভুত'।

মহিলা। তবে সে কি করে? তার ক্ষমতা কি?

মাধবী। তার অসাধারণ ক্ষমতা! তার বিক্রম অতি আশ্চর্য্য।

মলয়ের সমীরণ রণরথ যার।
পঞ্চাধিক নাহি শর ধৃক্ক করিবার ॥
নিজে সে অতনু কাম ফুলধনু করে।
যে ধনুর ছিলা বাঁধা মত্ত মধুকরে ॥
বসন্ত সামন্ত মাত্র নাহি অন্য মিত্র।
তথাপি সে বিশ্বজয়ী এবড় বিচিত্র ॥
নির্জ্জরও যার বাণে সদা জর২।
কার সাধ্য তার রণে হয় আগুসর ॥

সে দুর্জ্জয় মদন কি না করিতে পারে? এই বিশ্ব সংসারে তাহার অসাধ্য কি আছে?

মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি দেব দেবর্ষি দানব।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রাক্ষস মানব ॥
কন্দর্প করিয়া দর্প বাণ যদি ধরে।
অনায়াসে ত্রিভুবন পরাজয় করে ॥

ফুরালে কাঁদে বসি” এমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাব? তুইও আমার মতে আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেছিস্?

মাধবী। মহিলে কি কহিলে? কুলকামিনী দিগের পুরুষান্তর অভিলাষ করা বড়ই মন্দ। যদি বিধি নিরবধি সেই গুণনিধিকে বঞ্চিত করেন্ কি করি! এই অকিঞ্চিৎকর যৌবন ভার চিরদিন কি সঞ্চিত থাকিবে? কখনও কালের মুখে পড়িবে না? না পড়ুক, পরপুরুষের প্রতি কদাচ দৃষ্টি প্রদান করিব না।

মহিলা। তোর ভাই যেমন্ কথা,—‘পরপুরুষ আপনপুরুষ’ কি লো? পুরুষ হলেই হয় আমি যা বুঝি।

আপনার বল কারে, আপন নাহি সংসারে,
শুন সই বলি কিছু সার।
সকলি জেন লো পর, পর বিনা হিতকর,
কেহ নহে কদাচ কাহার॥
জন্ম হয় পর ঘরে, বিবাহ করিয়া পরে,
পরে দেশান্তরে নিয়া যায়।
পরঘরে হয় বাস, পর দ্রব্যে অভিলাষ,
পরবৈ কে কারে কোথা পায়॥
পরে প্রেম করে দান, পর প্রতি অভিমান,
হয় সবে পর সুখে সুখী।
পরদুঃখে দুঃখ পায়, পরের প্রেমের দায়,
পরস্পর দেখ বিধুমুখি॥
অমূল্য যৌবন ধন, পরে হবে বিতরণ,
পরনিয়া থাকা চির দিন।
পরের সঙ্গের সঙ্গী, পররঙ্গে সদা রঙ্গী,
দেখ সখি পরে পরাধীন॥

শুন্‌লি, আর কেন? এখন আয়, আমার সঙ্গে।

মাধবী। সখি লোকে বলে “কুকর্ম্ম করিলে পরকাল যায়,” তাই ভাবি, অল্পকালের নিমিত্ত পরকালটা নষ্ট করিব?

মহিলা। (হাস্যমুখে) মাধবি তোর বোধ নাই “পরকাল পরের কথা” তা বলে কি এখন উপস্থিত সুখে বিমুখ হওয়া যায়?

মাধবী। হাঁ তা ও বটে, কিন্তু আপাততঃ এই যে পোড়া পাড়ার লোকে অখ্যাতি করিবে তার কি করি দিদি ?

মহিলা। কে জান্তে পারিবে ? তুইও যেমন বৌন্।

মাধবী। প্রথমে নাই জানুক, কিন্তু 'গর্ভ হয়' তবেই বিভ্রাট।

মহিলা। বিভ্রাট্ কি ? 'তা হয় অপূর্ব্ব' একটা মুখুয্যে হবে'।

মাধবী। ছি সখি, সে কেমন ? লোকে হাসিবে, তার অপেক্ষা ও কর্ম্ম করাও তো ভালো ?

মহিলা। ভালো বটে, কেন কর্ব্বি ? এতেই লোক নিন্দা কি ? কুলীনের মেয়ে গঙ্গাজল ধুয়ে খায় এমন কে আছে ? আমি দুইবার ওকর্ম্ম করে ছি বটে, এখন আর হলে কখন কর্ব্বো না।

মাধবী। ভাই, মা বাপ কিছু মনে কর্ব্বে না ?

মহিলা। (হাস্য মুখে) তুই বড নেকা, তাঁরা কি জানেন না ? যখন কুলীনকে দেন তখনি জেনে থাকেন। তা যা হৌক, আমি এখন যাই ভাই।

মাধবী। (সকরুণবাক্যে) দাঁড়া দিদি, যদি সব বলিয্য তবে একটা কথা বল, এখন আমি কি করি ?

মহিলা। (সভ্রূভঙ্গে) আমাব সঙ্গে শ্রীহরি, আর কি করি ?

মাধবী তুই আমার রক্ষা না করিলে কে করিবে। চল তোর সঙ্গে যাই, যা করিস্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

[জাহ্নবী ও শাম্ভবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী। অলো শাম্ভবি, একি শুন্তে পাই লো, সত্যি সত্যিই নাকি 'বে' ?

শাম্ভবী। হাঁ দিদি, বুঝি সত্যিই হলো গো, সব উদ্যোগ হচ্চে দেখিলাম্।

জাহ্নবী। হায় কি বলিব !

নির্ব্বাণ হইলে দীপ করে তৈল দান।
পলায়িত হলে চোর হয় সাবধান॥
যৌবন বহিয়া গেলে বিবাহ বিধান।
মিথ্যা নয় লোকে কয় এতিন সমান॥

তাই এখন বিবাহ হলে কি হবে ?

যখন সে সরোবর তুল্য কলেবর।
নির্ম্মল লাবণ্য জলে ছিল মনোহর॥
চিক্কণ চিকুরচয় শৈবাল সমান।
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ সদা বিদ্যমান॥
কুচ কুমুদের কলি বদন কমল।
তৃষিত পথিক মন মধুপ চঞ্চল॥
নয়ন শফরী প্রায় কটাক্ষ মরাল।
সুশোভিত ভুজযুগ মৃদুল মৃণাল॥
যৌবন জলদ কাল অতীত দেখিয়া।
অমনি সে সরোবর গেল শুকাইয়া॥
এখন আইল পান্থ সন্তাপ পাইয়া।
উহাকে শীতল তবে করিব কি দিয়া॥

শাম্ভবী। হোক্ না, দেখা যাক্।

জাহ্নবী। তোর বরং হয় হোক্, আমার কি আর 'বের' সময় আছে ? আমি অন্তদন্ত হীন হয়েছি, এখন 'তীর্থে' যাওয়াই উচিত।

গায়ে দিয়া নামাবলি, মুখে হরি২ বলি,
চলে যাব নানা তীর্থ২ ান।
দেব দ্বিজে যথা শক্তি, পূজিব করিয়া ভক্তি,
মুক্তি পথ করিব বিধান॥
এবার সেথোর সাথে, যাইয়া ক্ষেত্রের রথে,

জগন্নাথ করিব দর্শন।
পরে বারানসী বাস, করেছিনু অভিলাষ,
বুঝি তার হইল খণ্ডন॥

ভাল শাম্ভবি, এখন কি আমি 'শিংভেঙে বাছুরের পালে মিষ্বো ?'

শাম্ভবী। দিদি, ক্ষতি কি ? হলোই বা।

জাহ্নবী। ছি! ছি! বলিস্‌নেঽ! লজ্জা করে।

হেন কথা কেবা কোথা কবে শুনিয়াছে।
বুড়োমাগী বাসরে আসর করে আছে॥
পোড়া মুখে আসে হাসি একথা শুনিয়া।
কেমনে বাসরে শুয়ে রব বর নিয়া॥
বাঁধিতে হইবে নাকি খোপা পাকা চুলে।
দাঁত গেলো মিষি কি ঘষিব দন্তমূলে॥
আহা কি কুলের গুণ পরিসীমা নাই।
হায়রে বল্লাল তোরে বলিহারি যাই॥

অলো শাম্ভবি, সে যা হোক্. কামিনী কোথায়, কিশোরীই বা কোথায়, জানিস্ ? আমিতো অনেকক্ষণ তাদের দেখিনাই।

শাম্ভবী। এখানকার মেয়ে ছেলের কথা কি বল্‌বো দিদি! শুন্‌লেম তারা নাকি বর দেক্‌তে গেছে।

জাহ্নবী। মরণ, আব কি, না দেক্‌তে গেলে হয় না ?

[কামিনী ও কিশোরীর প্রবেশ

কামিনী। অলো কিশোরী—দেক্‌তে পেয়েছিস্ কি

কিশোরী। দিদি দেখিছিও (করতালি প্রদান)

কামিনী। বল্‌না বোন্ ? কেমন—কি কচো—কোথা আছে।

কিশোরী। কি বল্‌বো দিদি, তোর চর্ম্ম চক্ষের সার্থক হলো না

দেখিলাম বাসায় বসিয়া আছে বর।
প্রবীণ বয়স শীর্ণ জীর্ণ কলেবর॥
রূপের কি কব কথা অতি অপরূপ।
ভুবনে তাহার কেহ নহে অনুরূপ॥
সিদ্ধিতে নাহয় সিদ্ধি আকিঞ্চন গাঁজা।
ঢুলু ঢুলু আঁখি মুখে উঠিতেছে গাঁজা॥

শূল ধরে সে বাতুল কপালে আগুন।
গুণের মধ্যেতে তার আছে তমোগুণ ॥
গঙ্গাকে ধরিয়া শাদা হয়েছে কি বেশ।
এবার সে দিগম্বর খেপা ব্যোমকেশ ॥
তমাক টানিয়া মরে কাশিতে২।
বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে ॥
মরণ পোঁড়ার মুখো কেনবা এসেছে।
চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা খুলিয়া বসেছে ॥

শুন্‌লি বরের কথা আর 'বেতে' সাধ আচে দিদি ?

কামিনী। তুই বুঝিস্‌নে—হওয়া ভাল রে।

কিশোরী। আমাদের যা হোক্‌, বড়দিদির কি কপাল ?

কামিনী। কেন লো ? তার কি হয়েচে ?

কিশোরী। (নিকটে দেখিয়া সপরিহাসে) হাঁ, এই যে নাম কত্তে না কত্তে বড়দিদি, সেজদিদি, দুজনেই এয়েচে।

জাহ্নবী। কিলো কিশোরি, কি বল্‌চিস্‌ বল্‌ না শুনি ?

কিশোরী। বড দিদি, বলি এমন কিছু নয়, তোর কথাই বল্‌চি, বলি তোর কি কপাল !

জাহ্নবী। কেন লো, আমার আবার কপাল কেমন ?

কিশোরী। (করতালি প্রদান পূর্ব্বক) এই "যেমন দেবা তেম্‌নি দেবী' মিলেচে ভাল।

শাম্ভবী। (জাহ্নবীকে অধোমুখী দেখিয়া) তা চল্‌ না ভাই, ঘরে গে বাবাকে বলি 'এমন বে কি না দিলেই হয় না ?

কামিনী। বাবা কি কর্ব্বে ভাই ? তাঁর দোষ কি ? সেই বল্লালে বেটাই যতো নষ্টের গোড়া।

শাম্ভবী। সে কি ? ও কথা বলিস্‌নে বাবারই সব দোষ ; তিনি কেন কুলের কাঁটা ফেলে যোগ্যবরে আমাদিগকে দিলেন্‌ না ; তা যাহোক্‌ বড়দিদি এ বের ফল কি বল দেখি শুনি।

জাহ্নবী। ফল নাই এমন কথা ! দ্বাদশীর দিন সকালেই নারিকেল, শশা, কলা, কতোয়াল আছে।

শুনিতে পারি না আর ঘরে যাই চল
এ বিয়া হইলে মাত্র একাদশী ফল ॥ [সকলের প্রস্থান ।

[বিরহিপঞ্চাননের প্রবেশ]

বিরহি। এই যে বেলা অবসন্না হইয়াছে। এক্ষণ ভগবান্ মরীচিমালী বিশ্বসংসার ব্যাপিনী কিরণ মালাকে সংহরণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন,—সূর্য্যদেব জলধি বলয়িত বসুন্ধরামণ্ডল বেষ্টন করিয়া পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আতিথ্যাভিলাষে কি পশ্চিমাচল চূড়ার প্রতি ধাবমান হইতেছেন? একি আশ্চর্য্য! যে সহস্রাংশুমণ্ডল, দুর্নিরীক্ষণীয় কিরণমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রাণিদিগের দর্শন পথাতীত ছিল, তাহা এক্ষণ সুদৃশ্যভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সুশোভিত করিতেছে। (সবিস্ময়ে) এই যে সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে২ আরক্তবর্ণ হইল! কমলিনীনায়ক নিজ নায়িকা কমলিনীর প্রতি যে অনুরাগ রাশি অপ্রকাশিত রূপে স্বকীয় মানস মন্দিরে রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভাবি বিয়োগ ভাবনায় হৃদয় বিদীর্ণ হইবাতে ঐ সঞ্চিত অনুরাগ রাশি গলিত হইয়া প্রকাশ পাইল, তাহাতেই কি আদিত্যমণ্ডল আরক্ত-বর্ণ হইতেছে? এই যে রবিমণ্ডল পশ্চিমে সিন্ধুসলিলে পতিত হইল!

অতিবক্তবপুঃস্খলদ্গতি র্বসুহীনো বিগতাম্বরোরবিঃ। পততি প্রতিবারি বারুণী বহুসেবাফলমেতদেবহি ॥

শরীর লোহিত বর্ণ স্খলিত গমন।
বসু* হীন হলো রবি করি বিতরণ ॥
অম্বর‡ ত্যজিয়া পড়ে জলধির জলে।
কেবল বারুণী// বহু সেবনের ফলে।

অতি বেগে সূর্য্যমণ্ডল সুদূর গগনতল হইতে জলমধ্যে পতিত হইলে তাহার অভিঘাত জন্য সমুত্থিত জল বিন্দু সকল কি তারাকারে পরিণত হইয়া আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে?

অয়মেতি বিস্তৃতকরঃ পুরতো দ্বিজরাজইত্যভিভয়াৎ কৃপণঃ। বিরলীবভূব রবিরাত্তবসুর্নহি যাচকেঽভিমুখতা সুলভা।

দ্বিজরাজ** সমাগত কর॥ প্রসারিয়া।
দেখি বসু[] নিয়া রবি গেল পলাইয়া ॥

* কিরণ ও ধন। ‡ আকাশ ও বস্ত্র। // পশ্চিমদিক ও মদ্য। ** চন্দ্র ও ব্রাহ্মণ। ॥ কিরণ ও হস্ত। [] কিরণ ও ধন।

একথা যথার্থ বটে নাহিক সংশয়।
কৃপণ যাচকে দেখি সংকুচিত হয়।।

জগতীতল এক্ষণ অস্মাদৃশ বিয়োগি ব্যক্তির হৃদয়ে নিজতাপ সমূহ সমর্পিত করিয়াই কি স্বয়ং সুশীতল হইল? অহহ! বিরহিজন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ নাই! যিনি নির্ম্মল কাবেরী বারিপূরে আপ্লুত হইয়া পরম পবিত্র হইয়াছেন,—যিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরগুণগ্রহণাদিরূপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরাশি সমুপার্জ্জন করিয়াছেন,—যাঁহার লোকত্রয়-চমৎকারি ধীরত্ব,—এবং যিনি জগতের প্রাণস্বরূপ, তিনিও মাদৃশ ব্যক্তির প্রাণ প্রয়াণে প্রয়াসী হইয়া অক্লেশে প্রচুর ক্লেশ প্রদানে উদ্যত!

পিকবর। তুমি মিষ্টভাষিতাদি—গুণে ভূষিত হইয়াও আমারদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে—সপক্ষ হইয়াও বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ—অথবা তুমি বনচর, সামাজিক নহ, তোমার হিতাহিত বিবেচনা কি?

হে মীনকেতন—তোমার এমন বিসম্বাদিনী প্রবৃত্তি কেন, তোমার যে নিজ নিকেতন মাদৃশ বিয়োগি-মানস, তাহারই বিনাশে উদ্যত হইয়াছ। জান না যদি ঐ মনোমন্দির ভগ্ন হয়, তাহা হইলে তুমি স্থানভ্রষ্ট হইয়া মহাকষ্ট পাইবে; বিশেষতঃ তুমি নিজ দেহ দাহ জনিত দুঃখ স্বয়ং অনুভব করিয়াও যে পরদেহ দহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহা আশ্চর্য্য!

ভাল মন—তোমাকেই অনুযোগ করি, তুমি শীঘ্র গমনে সমর্থ, তোমার পাথেয় বা সহচর সাপেক্ষ নহে,—তোমার পরাধীনতা নাই তথাপি তুমি যেন সেই সুলোচনা গোচরে গমন করিতেছ না? অথবা প্রিয়তমা ব্যতীত তুমি অবস্থান করিতে কদাচ পারগ নহ তুমি অবশ্যই সে স্থানে গমন করিয়াছ ইহা নিশ্চিত রূপে প্রতীয়মান হইল।

হে অন্তঃকরণ, তুমি সেই রম্ভোরু সম্ভোগে সদা সন্তোষি রহিয়াছ কিন্তু এই সহভব, সহবর্দ্ধমান, পরমপ্রেমাস্পদ এবং তোমার বিরহে অহরহ ম্রিয়মাণ যে এই শরীর ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া সেই অচির পরিচিত চারুলোচনার অনুগমনে তুমি কি নিতান্ত নিন্দনীয় হইতেছ না।

সেই ইন্দীবরাক্ষীর অপ্রত্যক্ষে নয়ন যুগলে জলধারা গলিত হইতেছে, তাহার পীযূষ সদৃশ মধুরালাপ শ্রবণাভাবে কর্ণকুহর ক্লেশ পাইতেছে, এবং তাহার শরীরস্থ সম্ভোগ না থাকায় কায় যষ্টি সাতিশয় শীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু মন, তুমি সে রঙ্গিণীর সততসঙ্গি হইয়াও যে প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করিতেছ তাহা আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ

সঙ্গমাবস্থা অপেক্ষা বিয়োগাবস্থাতেই তুমি সুখি ;—সকল ইন্দ্রিয়গণকে বঞ্চনা করিয়া এক্ষণ তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ- মধুরালাপ-লহরীশ্রবণ,—অধর-সুধাস্বাদন,—সুগন্ধি-নিশ্বাস সমীরণাঘ্রাণ—এবং সেই অনন্যাদৃশ সুশীতল-শরীর স্পর্শ ইহা সমস্তই তুমি অনুভব করিতেছ তবে তোমার ক্লেশ কি ? অথবা তুমি নিতান্ত লঘ প্রকৃতি, অনুযোগ যোগ্য নহ।

বিধাতাকেই ভৎ'সনা করা বিধেয়। ভো ভগবন্ বিধাতঃ, তুমি কি হেতু আমার ললাটপট্টে নিষ্ঠুরাক্ষর বিন্যাস করিয়াছ ? আমি তোমার কোন অপরাধ করি নাই, ! নিরপরাধে ক্লেশ দেওয়া বিবেচকের কর্ম্ম নহে ?

[বিবাহবাতুলের প্রবেশ]

বিবা। কেহে তুমি ? বিধাতার বিবেচনার কথা কহিতেছ, তাহার কি বিবেচনা আছে ? থাকিলে সে আপন সৃষ্টি বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইত না! তাহার প্রজা পালন করা দূরে থাকুক, সে তাহাদিগের ভূরিং ক্লেশ ধার্য্য করিয়াই অনার্য্য বল্লাল রাজাকে রাজ্য দিয়াছিল, বিবেচনা থাকিলে কি এমন হইত ?

বিরহি। কে হে, বন্ধু নাকি ?

বিবা। হাঁ ভাই, যাবে কি ? চল না যাই।

বিরহি। কোথা হে ?

বিবা। কুলপালকের বাড়ী, বিবাহ নিমন্ত্রণে।

বিরহি। না ভাই, আর বিবাহ দেখিবার প্রয়োজন নাই।

বিবা। দেখিতে যাওয়া ভালো হে, যদি প্রজাপতির গন্ধ গায়ে লাগে।

বিরহি। আর ভাই প্রজাপতির গন্ধে কায নাই, ঐ গন্ধেই অন্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় পূর্ব্বক সেই বিবাহবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি।

বিবা। ভাই বুঝনা, তবু ভাল, হইয়াছে তো, আমার যে এক বারও হইল না।

এবার মরিয়া আমি হইব বৈদিক্।
মারিব বল্লালে ঝাঁটা ভাবিয়াছি ঠিক্॥
কাণা খোঁড়া আতুর বা হই যদি অন্ধ।
তবু গর্ভে গর্ভে মোর হইবে সম্বন্ধ॥
পেটে থেকে পাড়িয়া করিব গিয়া বিয়া।
সংসারের সুখ হবে গৃহিণীকে নিয়া॥

খাড নাড়া ব্যঞ্জনের কতো বা আস্বাদ।
দেখিতে হইবে ভাই মনে বড সাদ ॥

বিরহি। (তৎ কথায় বিরক্ত হইয়া) ভাই রাত্রি হইল, ক্রমশঃ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গাঢ়তরতিমিরাবগুণ্ঠিত হইতেছে।

কমলিনী ব্যথিতা না হেরে দিনমণি।
মানিনী হইয়া মুখ মুদিল অমনি ॥
নিশাকর নিজ করে প্রকাশিত করে।
তথাপি আবৃত ক্ষিতি তিমির অম্বরে ॥

আহা! বন্ধো! দেখ দেখ, এই প্রদোষ কালে দোষাকরের উদয় হওয়াতে কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! বাসর গৃহাগত বরপাবের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি কুলকামিনী-কুলের ন্যায় তারাগণ নিশাকরকে সুশোভিত করিতেছে!

বিবা। বন্ধো, তুমি বিবাহ দেখিতে যাইবে না,? তবে আমি চল্‌লেম্।

[বিবাহ বাতুলের প্রস্থান।

বিরহি। (স্বগত) সায়ং সন্ধ্যা বিধি সমাপিত হইয়াছে (শঙ্খবাদ্য শ্রবণ করিয়া) শুনিলাম কুলপালকের কন্যাদিগের বিবাহ, তাহারি বুঝি শঙ্খবাদ্য। যাহা হউক সে অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি, আমি এক্ষণ স্বস্থানে প্রস্থান করি।

[বিরহিপঞ্চাননের প্রস্থান।

[কুলপালক ও ধর্ম্মশীলের প্রবেশ]

কুল। পুরোহিত মহাশয়, বুঝি বর আসিতেছেন, আপনি সত্বর অগ্রসর হইয়া আনয়ন করুন্। আর যাহাতে কোন প্রকারে বিবাদ বিষম্বাদ না হয়, দেখিবেন।

ধর্ম্ম। হাঁ আমিই যাই বটে, তুমি বরসজ্জ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সম্প্রদান স্থানে অবস্থান কর।

ধর্ম্ম। (বাটীরবাহিরে গমনোদ্যত হইয়াই) এই যে আসিতেছেন!

আয়াতি জাতিনিরপেক্ষকুলাবলম্বী ধর্ম্মানুপেক্ষ্য চ ধনে পরমার্থবোধঃ। দুর্দ্দর্শনো গত বয়াঃ শতশো বিবাহবাণিজ্যদীক্ষিতমতি র্ব্বরএষ তূর্ণং ॥

জাতিতে উপেক্ষা করি দীক্ষিত কুলেতে।
ধর্ম্মেতে অরুচি রুচি কেবল ধনেতে ॥
দেখিতে কুৎসিত বুড়ো বিবাহে লালসা।
এই বর রঙ্গ স্থলে আসিল সহসা ॥

কুল ও ধর্ম্ম উভয়ে। আসিতে আজ্ঞা হয়, আসুন্২।

[বরের সহিত অনৃতাচার্য্যের প্রবেশ, আসনে সকলের উপবেশন]

ধর্ম্ম। (স্বগত) এই বর! কুলপালক ইহাকে কন্যা দিবে, তাহাতেই কুলরক্ষা হইবে! হে বল্লাল, লোকে তোমাকে যে 'কলির চেলা কহে' তাহা যথার্থ। হে ভগবন্ জগদীশ্বর। তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে এতাদৃশ দুরবস্থা গ্রস্ত হইল!!!

[অভব্যচন্দ্রের প্রবেশ]

অভব্য। ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ। (উপবেশন)।

ধর্ম্ম। আপনি কে?

অভব্য। আমি পুরুত।

ধর্ম্ম। কাহার পুরোহিত আপনি?

অভব্য। ঐ যাঃ! নাম ভুলে গিছি! (চিন্তা করিয়া) হাঁ হাঁ, মহাশয় বলিতে পারেন ঐ যে যেযন্না বাতে চাইল ঝাড়ে তার নাম কি?

ধর্ম্ম। কুল।

অভাব্য। হাঁ হাঁ, ঐ বটে, ঐ ব্যক্তিই আমার যজমান, তার কি এই বাড়ি?

ধর্ম্ম। কুল কি? কুলপালক;—সে এই বটে, সে যে আমার যজমান।

অভব্য কি? সে আমার যজমান।

ধর্ম্ম। আমি তার কুলপুরোহিত চিরকাল আছি।

অভব্য। আমি তার কুল, ডালা, ধুচুনি, সব পুরোহিত, বহু দিন আছি।

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) পরিহাস কর যে? তুমি কোন সম্পর্কে পুরোহিত?

অভব্য। মাতামহ সম্পর্কে আমি পুরোহিত।

ধর্ম্ম। কি রূপ?

অভব্য। কিরূপ আবার কি? আমার মাতামহ ঠাকুর সেই গ্রাম দিয়া গঙ্গাস্নানে যেতেন, যে গ্রামে কুলপালক বে করে।

ধর্ম্ম। এ অতি অসঙ্গত কথা!

অভব্য। কিসে অসঙ্গত হলো?

ধর্ম্ম। কাহার মাতামহ কাহার শ্বশুরের গ্রামে কখন গমন করিয়াছে ইহাতে যে সে তাহার যজমান হয় ইহার প্রমাণ কি?

অভাব্য। "মাতামহস্ত দোষেণ রাক্ষসোঽভূদ্দশাননঃ" এই শাস্ত্রই প্রমাণ!

ধর্ম্ম। এ বচনের অর্থ কি?

অভাব্য। অর্থ থাকিলে কি যজমানের দ্বারে আসিতাম্?

ধর্ম্ম। (হাস্য মুখে) আপনার নাম কি?

অভব্য। শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

ধর্ম্ম। আপনি তো পণ্ডিত ভাল, উপাধি কিছু আছে ?

অভব্য। হাঁ আছে বৈকি, উপাধি 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন'।

ধর্ম্ম। 'জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন' উপাধি ? সে আবার কেমন্ ? 'নাম শুদ্ধ বলুন্ দেখি ?

অভব্য। (উচ্চৈঃস্বরে) শ্রীঅভব্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শুনিলেন ?

ধর্ম্ম। (সহাস্যমুখে) হাঁ শুনা গেছে, আমি কালা নই। আপনার বাটী কোথা?

অভব্য। এখন বাটীর প্রয়োজন কি ? যখন ডাইল খাই, তখনি তার দরকার।

ধর্ম্ম। বলি তা নয়, আপনার নিবাস কোথা ?

অভব্য। আঃ, ওসব্ কথায় কায্ কি ? পেটে বিদ্যে সাধ্যে থাকে এসো, লাগা যাউক।

ধর্ম্ম। (সভ্রূভঙ্গে)। হাঁ, বিচার আচার করিতে পারেন্ ?

অভব্য। (সগর্ব্বে) পারবো না কেন ? আচার পেলেই বিচার হয়

ধর্ম্ম। সে কেমন ?

অভব্য। তবে শুনুন্।

পান্তাতে আচার পেলে বড মজা হয়।
পর্ষ্টি' ভাতে পাতিলেবু সর্ব্ব' শাস্ত্রে কয়॥
কড়কড়ো হলে কাঁচা তেঁতুলের ঝোল।
তপ্ত ভাতে মজা বড়ো যদি মিলে ঘোল॥

ধর্ম্ম। (উচ্চ হাসে) বা, বা, উত্তম বিচার হলো।

অভব্য। একবারেই যে, "বাবা" বল্যে গাছে না উট্‌তেই এক কাঁদি"।

ধর্ম্ম। হাঁ, আবার রসিকতাও যে আছে ? আপনি কিছু পড়ে শুনে থাকেন ?

অভব্য। (সগর্ব্বে) কিছু কেমন ? রেতে পডে থাকি, দিনে শুনে থাকি।

ধর্ম্ম। কোন্ শাস্ত্র জানেন্ ?

অভব্য। সব রকম, কি না জানি ;

ধর্ম্ম। ব্যাকরণ, সাহিত্য, কিছু বলুন্, শুনা যাউক, এওতো বিবাহের সভা।

অভব্য। হাঁ বলা ভাল বটে, বিদ্যা যতো প্রকাশ হয় সেই লাভ, কিন্তু বুঝে এমন লোক কে ?

ব্যাকরণে মোর বিদ্যা বুঝিবে কি পরে।
ভবতি পচন্তি পেটে গজ গজ করে॥

বধে নাই স্বত্ব মোর নত্ব তে অগত্ব।
আত্ব আত্ব সিদ্ধিফলা কেবা করে তত্ব ॥
যে করে বিচার তার বুদ্ধি লোপ করি।
খ্যাত আছি শব্দ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কেশরী ॥
কাব্যেতে অভব্য নাম দেখ মোর আছে।
শ্লোক পড়ি হাড়ি মুচি চণ্ডালের কাছে ॥
অলঙ্কার শাস্ত্রে বিদ্যা বলিব কি বল।
আমি নাহি ছুঁই পরে ব্রাহ্মণী সকল ॥
কবিতা করিতে শক্তি অতি অনুপাম।
বাবা কেন না রাখিল কালিদাস নাম ॥
কবিতাতে যদি নাহি মিলে চতুষ্পদ।
মিলাইয়া দিই তাহে আমি চতুষ্পদ ॥
পাষণ্ড পণ্ডিত আমি নানা শাস্ত্র জানি।
স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই দেখ অনুমানি ॥
গোবধে ছপণ কড়ি ব্যবস্থা আমার।
অবিচারে কেবা পারে হেন শক্তি কার ॥
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে মোর বিদ্যা আছে ভারি।
এক হতে দশ অঙ্ক গণে দিতে পারি ॥
অনায়াসে দেখে বলি গর্ভবতী হাত।
হয় ছেলে নয় মেয়ে নয় গর্ভপাত ॥
ন্যায়েতে অন্যায় বিদ্যা বিদ্যমান আছে।
ঘটত্ব পটত্ব ভয়ে নাহি এসে কাছে ॥
গর্ব্বেতে পর্ব্বত ধূমে করো অনুমান।
কপালে আগুন মোর আছে বিদ্যমান ॥

ধর্ম্ম। (হাস্য মুখে) আপনি অতি উত্তম পণ্ডিত। পুরাণে কিছু দৃষ্টি আছে কি?

অভব্য। পুরণোনতুন সকলি পারি।

ধর্ম্ম। পারেন কেমযন্?

অভব্য। বলি আপনি তো নতুন চাইল পুরণো চাইলের কথা বল্‌চেন?

ধর্ম্ম। না না, তাহা নয়, পুরাণ শাস্ত্র (প্রাচীন বৃত্তান্ত) জানেন?

অভব্য। (সভ্রূভঙ্গে) পুরাণ ইতিহাস, তাই বলুন, আমি আর এট্টা বুঝে ছিলাম্।

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার ॥
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে বাছা হনুমান।
কহ২ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান ॥
পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার ॥
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন ॥

ইতিহাস কিছু বলিব ?

শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী।
রথের তলায় ওই দেখলো সজনি ॥
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা।
ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর সতা ॥

ধর্ম্ম। আর বিদ্যা প্রকাশে কায নাই, বুঝেছি ?

অভব্য। বুঝেছ তো মজেছ,—যে বুঝেছে সেই মজেছে।

ধর্ম্ম। কুলপালকের বাটীতে এসেছেন কি করিতে ?

অভব্য। কেন ? বে দিতে।

ধর্ম্ম। বিবাহ দিবার মন্ত্র জানেন ?

অভব্য। বিবাহ 'দিবার' মন্ত্র জানি না কিন্তু বিবাহ 'রাত্রের' মন্ত্র জানি।

ধর্ম্ম। হাঁ, তাই বলুন্ দেখি ?

অভব্য। বল্যে কি দেক্‌তে পাবেন্ ? শুন্তেই পাবেন্।

ধর্ম্ম। (স্বগত) অভব্যের নিকটেও অভব্য হইলাম ! (প্রকাশে) তা বলুন্।

অভব্য। শুনুন্,—"প্রথমে সংকল্প। বিষ্ণু'মোন্ত ফন্নারে মাসি কাড়াকাড়ি পক্ষে পুট্‌লি তিথৌ গোলমাল গোত্রস্য শ্রীমোণ্ডাচন্দ্র—"।

ধর্ম্ম। হয়েছে২, আর বল্‌তে হবে না, এতো সংকল্প তার পর ?

অভব্য। তার পর মেয়ে গুলো নাইয়ে এনে "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী। এবং শ্মশানানলদগ্ধোসি পরিত্যাক্তোসি বান্ধবৈঃ" ইহা বলিয়া বিবাহ দিবে।

ধর্ম্ম। হাঁ, এই বের এই মন্ত্রই বটে। আর কিছু আছে ?

অভব্য। পরে গাঁটি ছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করিবে "সর্ব্বনাশো মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈব চ। সর্ব্বাঙ্গে ধবলাকারঃ অন্নাষূর্ত্তব সম্প্রতি"।

তর্ক। (ধর্ম্মশীলের প্রতি) মহাশয়, ইনিই এ বিবাহের পৌরহিত্য কর্ম্মে উপযুক্ত, আমাদের এস্থানে থাকায় আর প্রয়োজন কি?

ধর্ম্ম। ভাল বলেছ, চল আমরা গৃহে যাই।

কুল। (পুরোহিতের গমনোদ্যম দেখিয়া) না মহাশয়, যাবেন্ কেন? আমার অদৃষ্টাধীন উনি এসেছেন, ভালই, আমি উঁহাকে স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিব; বিবাহ নির্ব্বাহ না হইলে আপনি যাইতে পারিবেন না।

ধর্ম্ম। ভাল, তোমার কথায়ই থাকিলাম।

কুল। মহাশয় যদিও আমাদিগের জাতিতে বিবাহ বিষয়ে কৌলীন্যই অপেক্ষণীয় বটে শিষ্টাচার দৃষ্টান্তে আপনি বরের পরিচয় লেন্।

ধর্ম্ম। (স্বগত) পরিচয় তোমার মাথা আর বল্লালের শ্রাদ্ধ। (প্রকাশে) হাঁ, উচিত বটে। কেমন হে, বাবাজী লেখা পড়া কি করিয়াছ?

——কৈ? কিছুই যে বলেন্ না? (স্বগত) বধিরতাও আছে না কি?

অনৃ। আঃ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে কি বিষয় বুদ্ধি মাত্র থাকে না? বিবাহ রাত্রে বর আর চোর—তুল্য; আজি বর কি কোথাও কথা কয়?

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) তুমি কেমন ঘটক হে? পরিচয় লব না?

অনৃ। অবশ্য—পরিচয় লবেন্ বৈতো নয়, আমিই পরিচয় দিতেছি, 'বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, ফুলের মুখটী' আর কি পরিচয়?

ধর্ম্ম। আমি, 'বিষ্ণুঠাকুর কি কৃষ্ণঠাকুর—ফুলের মুখটী কি ফলের মুখটী' তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই, লেখা পড়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অনৃ। হাঁ লেখার বিষয়টা বিস্মৃতক্রমে হয় নাই বটে।

ধর্ম্ম। সে কি! জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কি লিখিতে বিস্মৃত হয়, এ কেমন কথা?

অনৃ। হবে না কেন? বিধাতাই ভুলেছেন;—তিনি যদি ইহাঁর ললাটে 'লিখিবার' কথা লিখিতেন, তাহা হইলে ইনিও 'লিখ্‌তেন,' তাঁহারি ভুল, ইহাঁর দোষ কি? আর আপনি 'পাড়ার' কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তা যেথায় পড়ামেয়ের বে, সেথায় বরের 'পড়ার' কথায় প্রয়োজন কি?

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) বিলক্ষণ! রূপগুণ সকলি ভাল!

অনৃ। (সভ্রূভঙ্গে) কিসে মন্দ?

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) সব্ মন্দ।

অনৃ। মুখের কথা বলিলেইতো হয় না,—কি কি দোষ দেখান্।

ধর্ম্ম। শুন তবে।

অনৃ। বলুন্ আপুনি।

ধর্ম্ম। 'দেখিতে সুন্দর বর দাদ সব গায়।'

অনৃ। 'বিনাচক্রে শালগ্রাম শোভা নাহি পায়॥'

ধর্ম্ম। 'দেখিতেছি কিছু২ আছে জলদোষ।'

অনৃ। 'এ দোষ ইহার নয় এযে জল দোষ॥

ধর্ম্ম। 'উভয় চরণ যেন মুকি ভরা ওল।'

অনৃ। 'দেখ দেখি কিবা শোভা দেখিতে এওল॥

ধর্ম্ম। 'বসন্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে বিরূপ।'

অনৃ। 'শীতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ॥'

ধর্ম্ম। 'দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই।'

অনৃ। 'যে বলে উহাকে কাণা তার চক্ষু নাই॥'

ধর্ম্ম। কুলের পতাকা রত্নে এ কর্ম্ম করিয়া।

অনৃ। (জনান্তিকে) 'দক্ষিণা দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দেও বিয়া॥'

ধর্ম্ম। (স্বগত) শাস্ত্রে লিখিত আছে "সর্ব্বঃ স্বার্থং সমীহতে" সকলেই স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে পর্য্যটন করে, বিশেষতঃ "পুরীষস্যচ রোষস্য হিংসায়া তস্করস্যচ। আদ্যবর্ণং সমাদায় ধাতা চক্রে পুরোহিতং"॥ বিধাতা পুরীষের 'পু' রোষের 'রো' 'হি' আর তস্করের 'ত' এই চারি অক্ষর একত্র করিয়া 'পুরোহিত' করিয়াছেন, অতএব আমার এতো নিষ্ঠায় প্রয়োজন কি? অন্যের কন্যা অন্যে বিবাহ করিবে, তাহার ভাল মন্দ আমার বিবেচনায় বা কার্য্যকি। আমিতো দ্বিগুণ দক্ষিণা পাইব, তা হইলেই হলো (প্রকাশে) ওহে কুলপালক, আর পরিচয়ের সময় নাই। লগ্ন উপস্থিত, কন্যাদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক বিবাহ দেও, পরে পরিচয় হইবে।

কুল। যে আজ্ঞা, (কন্যানয়ন করিয়া বরকরে সমর্পণ)।

[নটের উক্তি]

বর দেখি রামাগণ করে গণ্ডগোল।
বিবাহ নির্ব্বাহ হলো হরি হরি বোল॥

ষষ্ঠঅঙ্ক।

সমাপ্ত।